মাটি আর নেই

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দুই

সমুদ্রের খাড়িতে সারা রাত মাছ মেরেছে গুপী। পার্শে, ভাঙন, ভেটকি, কাঠকই—নোনা জলের মিঠে মাছ।

উত্তর থেকে একটা নদী দক্ষিণের সমুদ্রে এসে মিশেছে। নদীটার পার ধরে মাইল পাঁচেক পিছিয়ে গেলে আবাদ অঞ্চল। জায়গাটার নাম পাতিবুনিয়া।

পাতিবুনিয়ায় রোজ জাঁকিয়ে হাট বসে।

সারা রাত খাড়িতে মাছ মারে গুপী। রাত থাকতে থাকতে সেই মাছ মস্ত এক চাঙারিতে ভরে পাতিবুনিয়ার হাটে বেচতে যায়। হাটের বিকিকিনি সেরে নয়া বসতে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নামে।

আজ বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।

গুপী একাই মাছের কারবার করে না। নয়া বসতের আরও অনেকে—যেমন কুবের সাঁইদার, মোতি, গগন, বিলেস, কুঞ্জ—প্রায় জন বিশেকের মাছের ব্যবসা।

অন্য অন্য দিন সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে হাটে যায়। গুপীর দেরি দেখে আজ সঙ্গীরা আগেভাগেই চলে গিয়েছে।

আকাশটা ফরসা হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পুব দিকটা জুড়ে মিহি কুয়াশার একটা পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দাটাকে বিঁধে বিঁধে দিনের প্রথম রোদ এসে পড়েছে নয়া বসতে।

দ্রুত হাত চালিয়ে চাঙারিতে মাছ ভরছিল গুপী। দুপুরের আগে আগে পাতিবুনিয়া পৌঁছতে না পারলে আজকের হাট পাওয়া যাবে না।

মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায় গুপী। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে ওঠে।

অস্থির না হয়ে উপায়ই বা কী?

নোনা জলের মাছের স্বভাব খুব ভালভাবেই জানে সে। বড় সুখী মাছ। রোদের সামান্য আঁচ লাগলেই পচে উঠবে। পচামাছ কানা কড়িতেও বিকোবে না। গুপীর সমস্ত রাত্রির খাটুনি জলে যাবে।

কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এখন রোদের ঢল নেমেছে।

রোদ লেগে মাছের রূপালী আঁশগুলি চকচক করে। লাল ঘেব দেওয়া চোখগুলি চুনীর মত জ্বলতে থাকে।

মাছের চাঙারি মাথায় তুলে সবেমাত্র গুপী দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ডাকটা কানে এল।

'হেই গো—শুনচ—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াল গুপী।

এ-জায়গাটা খাড়ির পারে। চারপাশে বেঁটে বেঁটে কদাকার চেহারার কয়েকটা গেমো গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

চনমন চোখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল গুপী। কিন্তু না, ডাকটাই শুধু শুনতে পেয়েছে। কারুকে দেখতে পাচ্ছে না।

কি করবে, গুপী বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ একটা গেমে গাছের আড়াল থেকে ভামিনী বেরিয়ে এল।

কুবের সাঁইদারের মেয়ে ভামিনী।

ভামিনী বলল, 'খুব যে চললে!'

'হ্যাঁ—'

অস্ফুট গলায় শব্দ করল গুপী।

'ঘরে মাছ নেই, বুঝেচ?'

ভামিনী বলতে লাগল, 'এক টুকরো মাছ বাপ রেখে যায় নি, সারা রাত যা ধরেচেল, হাটে বেচতে লিয়ে গেচে।'

গুপী জবাব দিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ভামিনী থামে নি, 'আমি আবার মাছ ছাড়া ভাত মুখে তুলতে পারি না। তুমিই বল ব্যাটাছেলে, আঁশের গন্ধ না থাকলে গলা দিয়ে কি ভাত নাবতে চায়! তুমিই বল—'

একদৃষ্টে গুপীর দিকে তাকিয়ে রইল ভামিনী।

মনে মনে গুপী বলল, 'মেছো পেত্নী।'

গুপীর মনের কথা অবশ্য ভামিনী শুনতে পেল না। নিজের খেয়ালেই সে বলছে, 'সেই সকালে উঠে মাছের খোঁজে বেরিয়েচি। তা কারুকে পেলম না। সবাই হাটে চলে গেছে। ভাগ্যিস তোমায় পেয়েচি—'

গুপী শঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল, 'তা আমি কি করব?'

'বা রে, কি করবে, আমায় বলে দিতে হবে।'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল ভামিনী। তারপর বলল, 'একটা মাছ দাও দিকিনি—'

চাঙারি থেকে মাঝারি আকারের একটা ভেটকি মাছ নামিয়ে ভামিনীর পায়ের কাছে রাখল গুপী।

ভামিনীর স্বভাব সবার জানা। এর-ওর কাছে যখন তখন সে মাছ চেয়ে বেড়ায়। না দিলে অকথ্য গালিগালাজ করে। স্বভাবটা জানে বলেই কেউ তাকে 'না' বলে না। তার মুখ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে মাছ দিয়ে দেয়।

মাছ দিয়ে গুপী চলতে শুরু করেছে।

ভামিনী আবার ডাকল, 'হেই গো ব্যাটাছেলে, কথা শেষ হল নি, চললে যে—'

গুপীকে বিপন্ন দেখাল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'মাছ দিলম, কথা ফুরল। আবার ডাকাডাকি করচ কেন?'

আজকাল তুমায় দেখতে পাই না কেন?

'কাজের ঝামেলায় থাকি। তাই দেখতে পাও না।'

বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে ভেটকি মাছটা ঝুলিয়ে গুপীর পিছুপিছু ছুটল ভামিনী। বলল, কিন্তুক তুমার সনগে যে 'কথা আচে, ঢেরকথা'

গুপীকে থামতেই হল। নাঃ, কুবের সাঁইদারের বেটির যা ভাবগতিক, তাতে হাটের দফা আজ নিকেশই হবে! বিরক্ত, রাগ-রাগ গলায় সে বলল, 'কী কথা?'

'লোতুন কথা আর কি কইব?'

ভামিনী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'সুখচরে থাকতে, মৌভোগে থাকতে, পাতিবুনেতে থাকতে যে-কথা বলেচি, সেই পুরনো কথা। তুমি বাপের কাছে যাও।'

'তুমার বাপের কাছে গে লাভ নি।'

'কেন?'

ঠাণ্ডা গলায় গুপী বলল, 'মেয়ের বে (বিয়ে) সে দেবে নি।'

'তুমার কানে কানে বলেচে!'

চিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল ভামিনী, কুবেব সাঁইদাব মেয়ের বে না দিয়ে ঘবে পুষবে।'

'সেরকমটাই তো শুনলম।'

চোখ কুঁচকে গুপীব মুখের দিকে তাকাল ভামিনী। বলল, 'কি রকমটা শুনলে?'

'শুনলম তার বড্ড খাঁই। তুমাব দর হেঁকেচে ন-কুড়ি টাকা। অত টাকা কুথায় পাব?'

একটু থেমে কি যেন ভাবল গুপী। আবাব বলল, 'তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবাব কী?'

'সে তুমি বঝতে চাইবে না।'

'বুঝতে চাইব না কেন গো ব্যাটাছেলে?' ফিসফিস গলায় ভামিনী বলল, 'পিরথিমীর কোন কথাটা বুঝতে না চাই!' বলতে বলতে গুপীব কাছে ঘন হয়ে এল সে।

একটু চুপ।

এদিকে রোদেব তেজ বাড়তে শুরু করেছে। পুব দিকটা জুড়ে এতক্ষণ যে কুয়াশার পর্দাটা ঝুলছিল, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ গুপী শুরু করল, 'শোন মুরুব্বির বেটি, এই পিরথিমীতে আমাদের জমিন লেই, ঘরবসত লেই, নিজের কইতে কিছু লেই।'

'এ আব লোতুন কথা কি? এ তো জানি।'

'লাও ঠ্যালা! কথায় কথায় খালি ঝগড়া। আগে শুনেই লাও।'

'বেশ তো, বল না—'

গুপী বলতে থাকে, 'জম্মাবাব আগে কুথায ছিলম, ভগবান জানে। জম্মে থেকে আমবা ঘুরেই মবচি। জোয়ান হবার পব ছিলম মাতলায। সেখেনে ঠেঙে হ্যালিডেগঞ্জ। হ্যালিডেগঞ্জ ঠেঙে সুখচব। সুখচব ঠেঙে মৌভোগ। মৌভোগ ঠেঙে পাতিবুনে। পাতিবুনে ঠেঙে এখেনে এযেচি।'

ভামিনী কিছুই বলে না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

গুপী থামে না, 'যেখেনেই আমবা ডেবা বাঁধি, জমিন হাসিল কবি, ফসল ফলাই, ভাঙা মাটি চোবস কবি, বন কেটে বসত বানাই, সেখেন ঠেঙেই জমিনদাব আব ভেড়িবাবুদেব লোকেবা আমাদের তাড়ায। খাঁটি কথা কি না মুরুব্বিব বেটি?'

'খাঁটি কথা।'

ভামিনী সায দেয়।

'তাড়া আব খেদানি খেতে খেতে পিবথিমীব শেষ মাথায এই সমুদ্দুরেব মুখে এসে পড়েচি। এখনও নিজেদেব জমিন হল নি। থিতু (স্থির) হয়ে বসতে পাবলম নি। বেদেব জাতেব মতন এখেনে ওখেনে ঘুরে ঘুবে মরচি।'

ভামিনী বলল, 'এই তো এখেনে জমিন হযেচে, ঘববসত হযেচে।'

অল্প একটু হাসল গুপী। বলল, 'দ্যাখ, এখেনে কদ্দিন টিকতে পাব না। কোনদিন দেখবে এখেন ঠেঙেও আমাদেব তাড়াবে।'

কাঁপা গলায ভামিনী বলল, 'এখেন ঠেঙে তাড়ালে যাব কুথায? এরপব তো সমুদ্দুব! আব তো মাটি লেই।'

'ভগবান জানে, আমিই কি জানি? সে জানে তুমাব বাপ। সে আমাদেব সর্দাব, আমাদেব মুরুব্বি।'

গুপীর একটা হাত ধরল ভামিনী। বলল, 'মুরুব্বির ভাবনা মুরুব্বি ভাবুক। আমাব ভাবনা তুমি এট্টুস ভাব দিকি ব্যাটাছেলে। বাপের হাতে ন' কুড়ি টাকা গুঁজে আমাকে তুমাব ঘবে লিযে যাও।'

বিড়বিড় কবে গুপী কি বলল, বোঝা গেল না।

ভামিনী বলল, 'আমার কথাটা শুনেচ?'

'শুনেচি।'

'তা হলে বাপের সন্‌গে দেখা করে বেবোস্থা করে ফেল।'

'না।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল গুপী। আস্তে আস্তে বলল, 'আগে নিজেদের জমিন হোক। তা'পর তুমার বাপের কাছে যাব।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কেউ কিছু বলছে না। না গুপী, না ভামিনী।

এক সময় ধরা ধরা গলায় ভামিনী শুরু কবল, 'কবে নিজেদের জমিন হবে, সেই আশায় বসে রইলে এ-জন্মে আমার বে হবে নি।'

ভামিনীর দিকে তাকিয়ে হয়ত একটু দুঃখই হয় গুপীর ভরসা দিয়ে সে বলে, 'হবে, হবে সাঁইদারের বেটি। নিশ্চয় হবে।'

একটু থেমে আবার সে শুরু করে, 'অনেক বেলা হল। এখন যাই। এখন কুনোদিকে নজর দেবাব ফুরসুত লেই।'

পুবদিকের আকাশ বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। রোদের তাপে খাড়ির নোনা জল গেঁজে গেঁজে উঠছে। বিরাট বিরাট ঢেউগুলি ফুলে ফুলে পাহাড় প্রমাণ হয়ে পাড়ের দিকে ছুটে আসছে

আর দাঁড়াল না গুপী। হন হন করে পাতিবনিয়ার হাটের দিকে পা চালিয়ে দিল।

যতক্ষণ গুপীকে দেখা গেল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ভামিনী। তারপর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে ভেটকি মাছটা দোলাতে দোলাতে নয়া বসতের দিকে চলতে লাগল।

অদ্ভুত শব্দ করে ভামিনী হাসল। হাসির দাপটে মাংসল থুত-নিতে গোল একটা গর্ত হয়ে গেল। পুরু পুরু দুটো ঠোঁট ফাঁক হয়ে তিনটে ক্ষয়া ক্ষয়া ভোতা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

নিজেকে শোনাতে শোনাতে চলেছে ভামিনী, 'মুখপোড়া বললে, কোনদিকে নজর দেবার ফুরসুত লেই। আঃ কথা শুনে মরে যাই। দেখেচিস, কোনদিন চোখের মাথা খেয়ে দেখেচিস! দিনরাত,

সব্বোক্ষণ চোখে কি পুরে রাখিস, তুই-ই জানিস। তোর ধম্ম তোর মনই জানে। একবার চোখ তুলে চাস ব্যাটাছেলে, ধাঁধা লাগবে। তা কি কোনদিন চাইবি? চোখ থাকতে যে আঁধা (অন্ধ)।'

ভামিনীর গায়ের রঙ নতুন তামার পয়সার মত চকচকে। টান-করা চামড়া থেকে জেল্লা ফুটে বেরোয। শরীরের অন্য অন্য প্রত্যঙ্গের তুলনায় বুক দুটি বড় বেশি পুষ্ট; খাটো আঙিয়ায় বাগ মানে না। গোল গোল দুটো চোখ; তারা দুটো ঈষৎ কটা। ভুরু দুটো জোড়া এবং রোমশ। সারা দেহে প্রচুর লোম। চারকোণা মাংসল মুখ। থ্যাবড়া নাক। মোটা মোটা আঙুলের মাথায় ভাঙা ভাঙা ক্ষয়া ক্ষয়া নখ।

এই রূপের ঠাট দেখাতে দেখাতে ভামিনী চলেছে।

সমুদ্রের খাঁড়িটা পেছনে রেখে, আবাদি জমি ডাইনে ফেলে একসময় নয়া বসতের সারবন্দি ঘরগুলোর সামনে এসে পড়ল সাঁইদারের বেটী।

তিন

নয়া বসতের সবচেয়ে পুরনো লোক হল কুবের সাঁইদার। কুবেরের কত যে বয়স, লেখাজোখা নেই। শুধু কি বয়সেই প্রবীণ সে ? অনেক দেখেছে কুবের, অনেক শুনেছে, অনেক জেনেছে। পৃথিবীতে অনেকগুলো বছর টিকে জীবনের সব গূঢ় রহস্যকে সে বুঝে নিয়েছে।

এমনি এমনিই কি কুবের মুরুব্বি হয়ে বসেছে! গুণে, বয়সে, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় সে এই দলের প্রধান। বঙ্গোপসাগরের মুখে এই নগণ্য জনপদটার সে মাথা।

এই কুবের সাঁইদারও জানে না, কবে থেকে তারা বেদের জাতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীতে এত মাটি, তবু কুবের সাঁইদারেরা নির্ভূম। পৃথিবীর কোথাও তাদের এতটুক দখল নেই, অধিকার নেই।

বিচিত্র একদল মানুষ।

সামান্য একটু মাটির খোঁজে কোন আদিম অতীত থেকে তাদের চলা শুরু হয়েছিল, তারা নিজেরাই জানে না। পায়ের তলায় পথ তাদের কোনদিন ফুরোয় নি।

সমুদ্রের মুখে আসার আগে এতকাল তারা শুধু চলেছেই।

দল বেঁধে, কালো কালো আরসা মাটি মাড়িয়ে, সীমাহীন ভেড়ি বাঁধ পেরিয়ে অবিরাম তারা চলেছে।

চলতে চলতে যেখানে পতিত জমি দেখেছে, কোদাল লাঙল নিয়ে নেমে পড়েছে। মাটি চৌরস করে ফসল ফলিয়েছে, ডেরা বেঁধেছে। যেখানেই বন দেখেছে, কুড়োল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বন কেটে বসত বানিয়েছে, নিষ্ফলা ডাঙা জমিকে সুফলা করেছে। আবাদ

যখন জমে উঠেছে, তখনই টাঙি-বল্লম হাতে জমিদার-মালিকের লোকেরা দেখা দিয়েছে। এদের বসত ভেঙে উৎখাত করে দিয়েছে।

লটবহর বেঁধে আবার তারা নতুন মাটির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

কত জায়গায় যে এরা আবাদ করেছে, কত পতিত নিষ্ফলা মাটিকে যে এরা সুফলা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বন কেটে জমি হাসিল করে পৃথিবীর সীমানাকে বাড়াতে বাড়াতে তারা চলেছে।

তবু মাটির ওপর তাদের দখল জন্মায় নি। বার বার তারা মাটি হারিয়েছে।

পৃথিবীর কোথাও তাদের স্থিতি নেই, স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই। চলতে চলতেই এদের শিশু জন্মেছে, বুড়ো মরেছে। নতুন মানুষ জন্ম পুরানো মানুষের জায়গা দখল করেছে।

চলতে চলতেই শিশু জোয়ান হয়েছে। জোয়ান বুড়ো হয়েছে। উর্বরা মেয়েমানুষ গর্ভিণী হয়েছে।

এদের চলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জন্ম-মৃত্যু, সমাজ-সংসার—জীবনের সমস্ত পালা অব্যাহত থেকেছে।

এদের জন্মাবার অনেক আগেই পৃথিবী ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। কোথাও এক ছটাক বেদখল মাটি পড়ে নেই।

ক্রমাগত তাড়া খেতে খেতে উত্তর থেকে দক্ষিণে, বাঙলা দেশের শেষ মাথায়, বঙ্গোপসাগরের এই মুখে এসে পড়েছে মানুষগুলো। এখান থেকে উঠে আর কোথাও যাবার মত এতটুকু মাটি নেই।

এখানে, এই সমুদ্রের ধারে নয়া বসত গড়েছে, জন্মের দিক থেকে যাদের কেউ কেউ বাউরী, কেউ বাগদী, কেউ মালো, কেউ কাহার। কে যে কি জাত, কে তার হিসেব রাখে।

জন্মগত বৃত্তি যাই হোক না, স্থিতিহীন জীবনে তারা সমস্ত কিছু হারিয়ে বসেছে। বঙ্গোপসাগরের মুখে এসে পৃথিবীর আদিম পরিচয়ে তারা ফিরে গিয়েছে।

এখন তারা কৃষাণ আর মাছমারা।

চার

কুবেরের ডেরার সামনে মানুষগুলো জমা হয়েছে। গুপী. গগন, বিলাস—সবাই এসেছে।

হাট থেকে ফিরে নয়া বসতের বাসিন্দারা রোজই এখানে আসর বসায়। প্রাণে ফুর্তি থাকলে কোনদিন সখিসোনার গান হয়. কোনদিন নতুন আবাদ সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ চলে। কোনদিন বা মাছের কারবার নিয়ে সবাই নতুন নতুন ফন্দি আঁটে।

তিন কোণায় তিনটে মশাল জ্বলছে। সাঁইদারের ডেরার সামনেটা আলো হয়ে গিয়েছে।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

দূরে ধানক্ষেতগুলোর ওপর গাঢ় অন্ধকারের পর্দা ঝুলছে। একরাশ জোনাকি আলোর ছুঁচের মত সেই পর্দাটাকে অবিরাম বিঁধে চলেছে।

সবার মাঝখানে বসেছে কুবের সাঁইদার।

কালো কুচকুচে মূর্তি। বুক-হাত-পা—সমস্ত দেহের পেশীগুলি পাথরের মত কঠিন, নিরেট। ঘাড়টা অস্বাভাবিক খাটো। বিরাট মাথা। পাটের ফেঁসোর মত রুক্ষ লালচে চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। চোখদুটো টকটকে লাল। মনে হয়, দু পিণ্ড তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কপালে একরাশ শিরা ডেলা পাকিয়ে ফুলে রয়েছে। কোমর থেকে একটা ময়লা টেনি হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। খসখসে চামড়া থেকে খই উড়ছে।

চেহারা দেখে কুবের সাঁইদারের বয়স আন্দাজ করা দুরূহ ব্যাপার।

কুবেরকে সবাই মুরুব্বি বলে ডাকে।

একপাশে চুপচাপ বসে ছিল গগন। গগন ওস্তাদ গায়েন। সে ডাকল 'হেই গো মুরুব্বি—'

'কী কইচ ?'

গগনেব দিকে ঘুরে বসল কুবের।

আজ হাটে মাছ বেচে বেশ লাভ করেছে গগন। মনটা বেশ খুশী আছে। সে বলল, 'কইছিলাম, এট্টুস গাওনা-বাজনা হোক।'

কুবের বলল, 'গাওনা-বাজনা রাখ উস্তাদ। আজ অন্য সলা আচে।'

'কিসেব সলা ?'

মানুষগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। সলা-পরামর্শের কথা শুনে সবাই কুবেরের চারপাশে ঘন হয়ে এল।

মশালের আলো এসে পড়েছে সাঁইদারের মুখে। অপ্রচুর, লালাভ আলো। রুক্ষ চুল, লাল চোখ, পাথরে-খোদাই পেশী—সব মিলিয়ে কুবেরকে আশ্চর্য রহস্যময় দেখাচ্ছে।

কেশে গলাটা সাফ করে নিল কুবের।

সবাই জানে কুবেরের এই কাশিটা ভূমিকা মাত্র। এর পরেই সে আসল কথাটা পাড়বে।

কুবের শুরু করল, 'তুমাদের সবার তো মনে আচে, কদ্দিন আগে আমরা এখেনে এয়েচি ?'

'আচে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'তা পেরায় (প্রায়) দু-বচ্ছর হতে চলল।'

গগন শুধরে দিল, 'আসচে বর্ষায় পুরো দু-বচ্ছর হবে।'

একটু চুপ।

কুবের সাঁইদার বলল, 'দু বচ্ছরের ভেতর কেউ তো আমাদের তাড়াতে এল নি। মনে হচ্চে, এ জায়গাটার মালিক লেই।'

'তাই তো মনে হচ্চে।'

সবাই একসঙ্গে সায় দিল।

'মালিক থাকলে অ্যাদ্দিন হাত-পা গুটিয়ে চুপ মেরে বসে থাকত নি গো স্যাঙাতেরা।'

গগন বলল, 'ঠিক কথা।'

সাঁইদার বলতে লাগল, 'আর আর বার দেখনি, ডেরা বাঁধতে না বাঁধতে মালিকের লোকেরা আমাদের খেদিয়েচে। হেই সুখচরে, পাত্তিবুনেতে, মাতলায়—কুথাও পুরো বচ্ছর কাটাতে পাবি নি।'

লোকগুলো কিছু বলছে না। একদৃষ্টে সাঁইদারেব দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আবেগে সাঁইদারের গলাটা ধরে এল, 'খালি ঘুবেই মবচি। এট্টুস মাটিব খোঁজে পিরথিমীর এক মাথা ঠেঙে খেদানি খেতে খেতে আর এক মাথায় এসে পড়েচি।'

চারপাশের মানুষগুলো আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

কুবের নিজের মনেই বলে যায, 'ত্ব-বছর তো একবকম ভালয ভালয় কাটল। কি বল সব?'

'ঠিক কথা।'

সবার হয়ে গগন জবাব দিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

সাঁইদারের চোখ ত্বটো স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে। খানিকটা দূরে ধানক্ষেতগুলোর ওপর অন্ধকারের একটা পর্দা ঝুলছে। সাঁইদারের চোখ সেই পর্দাটার ওপারে অনেক, অনেক দূরে কি যেন দেখছে।

হঠাৎ-ই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সাঁইদার।

গগন ডাকল, 'হেই গো মুরুব্বি—'

'কি কইচ উস্তাদ?'

চমকে ঘুরে বসল কুবের। বলল, 'লাও—বল—'

'কইচিলম, অ্যাদ্দিন পর আমরা তবে মাটি পেলম!'

'সেরকমটাই লাগচে।'

অন্ধকারের ওপারে দৃষ্টিটা রেখে কুবের বলতে থাকে, 'অ্যাদ্দিনে এই সমুদ্দুরের মুখে এসে আমাদের জমিন হল। মন কইচে, আর আমাদের বেদের জাতের মতন ঘুরে মরতে হবে নি।'

সাঁইদারের ডেরার সামনে নয়া বসতের মানুষগুলো গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।

বাঙলা দেশের দক্ষিণ সীমান্তে, বঙ্গোপসাগরের মুখের এই জায়গাটুকু তারা আসার আগে কেউ দখল করে রাখে নি। এই জায়গাটার মালিক নেই।

কুবের সাঁইদাররা এই প্রথম মাটি পেল। মাটি পাওয়ার অসহ্য সুখে তাদের চোখগুলো চকচক করতে থাকে।

রাত বাড়ে। অন্ধকার গাঢ় হয়। খাড়ির দিক থেকে জলো বাতাস ছুটে আসে।

বাতাস আর অন্ধকারের সঙ্গে যুঝে যুঝে মশালটা পেরে উঠছে না। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

এক সময় দুই হাটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে মানুষগুলো ঢুলতে লাগল।

সারারাত তারা খাড়িতে মাছ মেরেছে অন্ধকার থাকতে থাকতে তিন ক্রোশ হেঁটে থাতিবুনিয়ার হাটে গিয়েছে। আবার তিন ক্রোশ ভেঙ্গে নয়া বসতে ফিরে সাঁইদারের ডেরার সামনে ঘন হয়ে বসেছে।

এতক্ষণ মাটি পাওয়ার আনন্দে তারা বুঁদ হয়ে ছিল রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ঘুম তাদের ভর করেছে।

ঘুমের আর দোষ কি?

দিবারাত্রি এরা অবিরাম খাটে। মাছ মারে, জমি কোপায়, বন কাটে। তারপর সন্ধ্যে হলে আর বসে থাকতে পারে না। চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে।

ঘুমভরা জড়ানো গলায় কে যেন বলল, 'আর কিছু কইবে মুরুব্বি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দরকারী কথা আচে।'

সাঁইদার ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'খরখর (তাড়াতাড়ি) দরকারী কথাটা সেরে ফেল। রাত

হল ঘরে ফিরে খেয়ে দেয়ে এট্টুস জিরিয়ে আবার মাছ মারতে বেরুব। কাল হাট ধরতে হবে নি?'

'হ্যা-হ্যা—'

সাঁইদার বলল, ঠিক বলেচ। কাজের কথাটা সেরে এক্ষুনি তুমাদের ছেড়ে দোব।'

'বল মুরুব্বি—'

ঢুলতে ঢুলতে মাথা তুলল মানুষগুলো।

কুবের বলল, 'অ্যাদ্দিন ভেবেচিলম, এ-জায়গাটারও মালিক আচে। কোন দিন এসে আমাদের বসত ভেঙে দেবে। তাই গা করি নি। কার না কার জমিন। গা করে কি করব?'

একটু থেমে আবাব, 'কিন্তুক এই জমিন আমাদের হয়েচে।'

মানুষগুলো খাড়া হয়ে বসল।

কুবের বলতে লাগল, 'সবাই তো দেখেচ, সমুদ্দুরের খাড়ি কেমন মাটি ভাঙচে। পাড় ভেঙে লোনা জল যদি একবাব ধানক্ষেতে সেঁদোয় (ঢোকে) ফসলের দফা নিকেশ হয়ে যাবে। এত কষ্টেব আবাদ লষ্ট হয়ে যাবে। জমিন পেয়েও লাভ হবে নি।'

'কি হবে মুরুব্বি?'

ভয়ে ভয়ে মানুষগুলো বলল। বিপদেব আশঙ্কায় তাদের ঘুম একেবারেই ছুটে গিয়েছে।

কুবেব অল্প একটু হাসল। বলল, 'ডরের কিছু লেই গো স্যাঙাতেরা।'

'ডর লেই!'

'না.

মানুষগুলো ভরসা পেল। সাঁইদার যখন অভয় দিয়েছে, তখন তাদের ভাবনার কিছু নেই।

কুবের তাদের মুরুব্বি, তাদের সাঁইদার। যখনই তাদের জীবনে কোন সমস্যা, কোন বিপদ দেখা দেয়, উন্মুখ হয়ে সবাই কুবেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু আশা একটু আশ্বাস চায়।

[illegible] সব ঝড়-ঝাপটা থেকে ওদের দুহাত বাড়িয়ে আগলে আগলে রাখে।

এই মানুষগুলো নিজেদের সব দায়, সব দায়িত্ব কুবেরের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আছে

কে যেন বলল, 'তুমি আমাদের মুরুব্বি। তুমি য্যাখন কইচ, ডর লেই, ত্যাখন আর ভাবচি না।'

কুবের বলল, 'ভাবতে হবে, সবাইকে ভাবতে হবে। এ আমার একার ভাবনা না। শোন, বন্যা আসার আগে ধানক্ষেত বরাবর লোতুন মাটি চাপাতে হবে। লোনা জল না ঠেকালে উপায় থাকবে নি। মিঠেল মাটিতে একবার লোনা ধরলে সব্বোনাশ হয়ে যাবে। তু-দশ বচ্ছরের ভেতর আর ফসল ফলবে নি।'

'খাঁটি কথা।'

সবাই সায় দিল।

'আসচে হপ্তা থেকে সবাই ধানক্ষেতের বাধে মাটি ফেলব। কথা রইল।'

'হাঁ।'

'পাকা কথা কিন্তুক।'

গগন বলল, 'লিচ্চয় পাকা কথা।'

কুবের বলল, 'এবারে তুমরা ঘর যাও।'

সবাই উঠে পড়ল। সবার সঙ্গে সঙ্গে গুপীও উঠে দাঁড়িয়েছে।

কুবের বলল, 'হেই গুপী, তুই যাস নি। তোর সনগে এট্টা দরকারী কথা আচে। এট্টুস বসে যা।'

অগত্যা গুপীকে বসতেই হল।

সবাই চলে গিয়েছে।

কুবের বলল, 'এক ছিলুম তামাক সাজ দিকি গুপী। জুত করে টানি। অনেকক্ষণ তামাক খাই নি। গলাটা কেমন যেন খুচখুচ করচে।'

ডাবা হুঁকো, আগুনের হাঁড়ি, নারকোলের ছোবড়া, তামাকের ডিবে—হাতের কাছেই সব সরঞ্জাম রয়েছে।

নারকেল ছোবড়ার একটা ঠিক্‌রে পাকিয়ে [illegible] গুপী
তারপর কলকেতে তামাক সাজতে লাগল।

সমুদ্র কাছে থাকার জন্য ছয় ঋতু বারোমাস বাতাসে হিমে আমেজ মিশে থাকে।

এখন উত্তুরে বাতাস দিয়েছে। শীত-শীত লাগছে।

পাশেই একটা গামছা পড়ে ছিল। গামছাটা সারা গায়ে ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে নিল কুবের।

গুপীর তামাক সাজা হয়ে গিয়েছিল। হুকোটা সাঁইদারের দিকে বাড়িয়ে সে বলল, 'এই লাও—'

ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানছে সাঁইদার। নাক-মুখ দিয়ে ভর-ভর করে ধোঁয়া ছাড়ছে। দা-কাটা তামাকের কড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

তরিবত করে বার কতক টেনে হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা নামাল কুবের। সেটা গুপীর হাতে দিতে দিতে বলল, 'টান, কষে টান। বেশ মোজ (মৌজ) হবে।'

সাঁইদারেব হাত থেকে কলকেটা নিতে নিতে গুপী বলল, 'আমায় কিছু কইবে ?'

'হ্যাঁ—সেই জন্যেই তো তোকে ধরে রাখলম।'

'তা হলে কথাটা সেরেই ফেল।'

একটু চুপ।

খাকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল কুবের। কেমন করে কথাটা পাড়বে, মনে মনে একবার ভেঁজে নিল। একসময় শুরু করল, 'এই সমুদ্দুরের মুখে ইসে আমরা তো মাটি পেলম।'

অস্ফুট গলায় গুপী কি বলল, বোঝা গেল না।

'সুখচরে থাকতে, পাতিবুনেতে থাকতে তোকে এট্টা কথা বলেচিলম। মনে আচে ?'

'কী কথা ?'

নিরুৎসুক গলায় গুপী শুধলো।

'কী কথা! ভুলোচ্চস!'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল কুবের। তারপর বলল. 'বলেচিলম, য্যাখন আমাদের নিজেদের মাটি হবে, তোর সন্‌গে ভামিনীকে গেঁথে দোব। মনে পড়চে?'

গুপী কিছু বলল না। সাঁইদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কুবের আবার বলল, 'এবারে ন-কুড়ি টাকা যোগাড় কর.। মেয়ের বে (বিয়ে) দোব।'

গুপী চুপচাপ বসে রইল।

কুবের ডাকল, 'হেই গুপী—'

'কী কইচ?'

'মুখে কী পুরেচিস? কথা কইচিস না যে?'

'কী কইব?'

'লাও ঠ্যালা—'

কুবের অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'আমি 'বে'র (বিয়ের) কথা পাড়লম। তুই কিছু কইবি তো। কী কইবি, তা কি আমি বলে দোব?'

'কী আর কইব মুরুব্বি!'

গুপী বলতে লাগল, 'দু-বছর এখনও পুরল নি। আরও ক'দিন ছ্যাখ, এই জায়গার কেউ মালিক বেরিয়ে পড়ে কিনা! তুমার মেয়েও আচে, আমিও আচি। বে (বিয়ে) তো আর পালাচ্চে না।'

'অ।'

অস্ফুট একটা শব্দ করল কুবের।

গুপী উঠে পড়ল। বলল, 'এখন যাই মুরুব্বি।'

'এখুনি যাবি! কথা তো শেষ হল নি।'

'আজ থাক। আরেক দিন হবে।' গুপী বলল, 'চৌপর দিন খুব খাটুনি গেচে। আর বসে থাকতে পারচি না! বড্ড ঘুম পেয়েচে।'

কুবের বলল, 'তা হলে আজ যা।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুপীকে ছেড়ে দিতে হল।

কুবের মুরুব্বির ঘরের পাশ দিয়ে পথ।' [illegible] এঁকেবেঁকে নয়া বসতের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে।

গুপী পথে এসে উঠল। সারা দিন খুব খাটুনি গেছে। এখন ঘুমে চোখ দুটো আপনা থেকে জুড়ে আসছে।

ঢুলতে ঢুলতে গুপী চলেছে।

'হেই গো—শুনচ—'

পাশ থেকে কে যেন ডাকল। গলাব আওয়াজটা সাপের হিঁস্ হিসানির মত শোনাল।

গুপী চমকে উঠল। মুহূর্তে ঢুলুনি ভাবটা ছুটে গেল। এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল সে। কিন্তু কারুকেই দেখতে পেল না।

'এই যে—ইদিকে—'

আবার সেই গলাটা শোনা গেল।

এবার গুপীর চোখে পড়ল। কুবের মুরুব্বির ঘরের গা ঘেঁষে ভামিনী দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার গোল গোল ছোট চোখদুটো ঝিকঝিক করছে।

ভামিনী ডাকল. 'কাছে এস, কথা আচে।'

'কি কথা?'

গুপী ভামিনীর কাছে গেল না। পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল।

'অতদূর ঠেঙে কি কথা হয়? ইদিকে এস—'

'বল না, এখেন ঠেঙেই শুনতে পাব।'

অগত্যা ভামিনীই এগিয়ে এল। ফিসফিস গলায় বলল. 'বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমার আর বাপের সব কথাই শুনেচি।'

'শুনেচ. বেশ করেচ।' নিস্পৃহ গলায় গুপী বলল, 'আমি এখন যাই, বড্ড ঘুম ধরেছে।' যাবার জন্য গুপী পা বাড়াল।

'শোন—'

ভামিনী ফুঁসে উঠল, 'বে'র কথা উঠলে তুমি অমন এড়িয়ে যাও কেন?'

'কুথায়?'

'কুথায় !' হঠাৎ গলাটা নরম করে ফেলল ভামিনী। বলল, 'মনে কর, আমি কিছু বুঝি না !'

গুপী জবাব দিল না !

ভামিনী বলতে লাগল, 'সব জানি, সব বুঝি। জানতে বুঝতে কিছু বাকী নেই।'

'কি জান ? বল—'

'নিশি মাগীর জন্যে আজকাল তোমার পেরাণে বড্ড দরদ।'

'কে বললে ?'

গুপীর গলা কেঁপে গেল।

'কে আবার কইবে ? আঁধা (অন্ধ) তো লই। রোজ রোজ নিশির কাচে যাও। গুজগুজ করে কত কথা কও। সবই চোখে পড়ে।'

গুপী বলল, 'নিশির কাছে যাই—এ খপর তো নয়া বসতের সবাই জানে।'

'তা জানে।' একটুক্ষণ চুপ করে রইল ভামিনী। কি যেন ভাবল। তারপর ফিসফিস গলায় বলল, 'কিন্তুক আজকাল বড্ড বেশি যাচ্চ। এবেলা-ওবেলা, দুবেলা যাচ্চ। তাই না ?'

গুপী থতমত খেয়ে গেল। ভামিনীর কথার কি জবাব দেবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

ভামিনী বলল, 'কি গো, কথা কইচ না যে ? বোবা হয়ে গেলে নাকি ? অ্যাই—'

'কি কইব ?'

'ওই যে শুদোলুম, আজকাল ঘন ঘন নিশির কাছে যাচ্চ কিনা ?' কথা শেষ করে একদৃষ্টে গুপীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভামিনী।

গুপী বলল, 'কি করি বল ! নিশির মাথার ওপর কেউ নেই। তাই এট্টু দেখাশুনো করতে যাই।'

'দেখাশুনো করতে যাও, ভাল কথা। কিন্তুক দেখাশুনো করতে গিয়ে পেরাণে যে 'অং' (রং) ধরিয়ে ফেলেচ।' বলেই হেসে উঠল ভামিনী।

হাসলে ভামিনীকে অদ্ভুত দেখায়। গালের মাংস ঠেলে উঠে ছোট ছোট চোখ দুটিকে প্রায় বুজিয়ে ফেলে। ক্ষয়া ক্ষয়া তিনটে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। দুই গালে দুটো গোলাকার গর্ত হয়ে যায়। যতক্ষণ সে হাসে, কেমন একটা ভোতা, খ্যাসখেসে আওয়াজ হতে থাকে।

গুপী বলল, 'অং', কিসের 'অং' ?'

'কিসের 'অং' বোঝ না ?' বিদ্রূপে ভামিনীর ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল। তীব্র গলায় সে বলল, 'ন্যাকা—'

'অং' অর্থাৎ রং। এ রং ভালবাসার রং। পিরীতের রং। প্রাণের রং। রং-এর অর্থ এখানে খুব গভীর। রং এখানে প্রেমের সমর্থক।

খানিকটা চুপচাপ।

ভামিনীই আবার শুরু করল। এবার তার গলাটা হিসহিস করে উঠল, 'কিন্তুক আমিও মুরুব্বির বেটি। মনে মনে তুমি যা ভেবেচ, তা হবে না। নিশি মাগী কত বাড় বাড়তে পারে, আমি দেখব।'

অনেকটা রাত হয়েছে। আর দাঁড়াল না গুপী। হনহন করে নিজের ডেরার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

গুপী যদি একবার পেছন ফিরত, দেখতে পেত, কুবের মুরুব্বির ঘরের পাশে, অন্ধকারে একজোড়া চোখ ধিকিধিকি জ্বলছে।

পাঁচ

নিশির ওপর ভামিনীর খুব আক্রোশ। এই আক্রোশ কি অকারণে? নিজের ডেরার দিকে চলতে চলতে গুপী ভাবতে লাগল।

ক'বছর ধরে আশায় আশায় আছে ভামিনী। গুপীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কিন্তু দিন যাচ্ছে, মাস যাচ্ছে, ঋতুর চাকায় সময় পাক খাচ্ছে। পুরনো বছর ঘুরে নতুন বছর আসছে। তবু বিয়েটা আর হয়ে উঠছে না।

বছর দুই হল, সমুদ্রের মুখে এসে গুপীরা নতুন বসত গড়েছে। তাদের স্থায়ী একটা ঠিকানা হয়েছে। হয়ত এর মধ্যেই বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু যোগেন মরে সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

যোগেন গুপীর সাঙাত। প্রাণের মিতে। মিতে কথাটা বোধ হয় পর্যাপ্ত নয়। একটা অখণ্ড সত্তাকে দু-ভাগ করলে, এক ভাগে গুপী, অন্য ভাগ যোগেন। একসঙ্গে তাদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কাজ-কারবার ছিল। একজনের সুখে ছিল আরেক জনের সুখ। একজনের দুঃখে আরেক জনের দুঃখ। শোক-উৎসব, সুখ-দুঃখ— জীবনের সব অবস্থাতেই তারা ছিল পরস্পরের কাছাকাছি।

বছরখানেক আগে সাতদিনের জ্বরে যোগেন মরে গেল।

যোগেন মরল কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকল না। সম্পর্কের একটি জের সে রেখে গেল। এই জের হল নিশি।

'নিশি—নিশি —'

চলতে চলতে বার দুই নামটা আওড়াল গুপী।

নিশি যোগেনের বউ।

সংসারে দ্বিতীয় মানুষ নেই। যোগেন মরার পর বিধবা নিশি একেবারে অথই সমুদ্রে পড়ল।

একে মেয়েমানুষ, তার ওপর যুবতী বিধবা। তার ওপর কেউ নেই। সুবিধে বুঝে ডাঙার কামটগুলো তার চারপাশে ঘুরঘুর শুরু করল। সুযোগ পেলেই তাকে ছিঁড়ে খাবে।

নিশি শুধু যুবতীই না, রূপসীও।

বেওয়ারিশ যুবতীর কাছে নানা জনে নানা পথের হদিস নিয়ে আসে। নিশির কাছেও তারা এল।

কিন্তু কোন পথটা সু আর কোনটা কু, কোন পথটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, নিশি বুঝে উঠতে পারছিল না। সবেমাত্র যোগেন মরেছে। কোন কিছুই স্থিরভাবে ভেবে দেখার মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল না।

নিশি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

দূর থেকে গুপী নজর রাখছিল। এমনিতে তার কোন দায় নেই। কিন্তু নিশি তার মিতের বউ। দায় না থাকলেও আছে।

মাংসাশী কামটগুলো নিশিকে জালিয়ে মারছে। অগত্যা গুপী এগিয়ে গেল। শুধু এগিয়েই গেল না, নিশিকে দেখাশোনার ভার নিল। তার চারপাশ থেকে কামটগুলোকে তাড়িয়ে দিল।

হয়ত অথই পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যেত নিশি। যে জীবনে শুধু গ্লানি আর অন্ধকার, যে জীবন অসৎ অসামাজিক, তার ভেতর হারিয়ে যেতে পারত। গুপী এসে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

সেই দিনটার কথা আজও পরিষ্কার মনে করতে পারে গুপী। কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিশি বলেছিল, 'তুমি আমায় বাঁচালে। তুমি না এলে কামটগুলোন আমায় খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলত।'

সেই শুরু।

তারপর থেকে প্রায় রোজই নিশির কাছে যেতে লাগল গুপী। কখন তার কি দরকার, কিসে তার সুবিধে, কিসে অসুবিধে—সব কিছুর খোঁজ নিতে লাগল।

গুপী নিশির কাছে যায়, প্রথম থেকেই এটা সুনজরে দেখে নি ভামিনী। বার বার সে তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, 'নিশির কাছে এত যাচ্চ, দেখো আবার মজে যেও নি।'

গুপী বলত, 'না-না, সে ডর নেই।'

'না থাকলেই ভাল' ভামিনী বলত, 'হুশ রেখে নিশির সঙ্গে মিশো। ও সোয়ামীখাকী রাঢ়ী (বিধবা)। ওর খিদে কিন্তু ভীষোণ। যাকে হাতের কাচে পাবে তাকেই খাবে।'

এ-কথার জবাব দিত না গুপী।

হাঁটতে হাঁটতে নয়া বসতের মাঝখানে এসে পড়েছে গুপী। এখনও আরও খানিকটা যেতে হবে।

নয়া বসত এখন নিষুতিপুর। কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না। সবাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। সমুদ্র মুখের এই নগণ্য উপনিবেশটা এখন নিবিড় ঘুমে তলিয়ে আছে।

আকাশটা অন্ধকার। আজ কি তিথি, কে জানে। চাঁদ ওঠে নি। তারায় তারায় চারদিক ছয়লাপ।

আকাশটা যেন একটা জামদানি শাড়ি। তারাগুলো তার গায়ে রুপোর বুটির মত আটকে আছে।

আকাশ-তারা-অন্ধকার—কোন দিকেই নজর নেই গুপীর। ভাবতে ভাবতে সে চলেছে।

কামটগুলোর হাত থেকে সে তো নিশিকে বাঁচাল। কিন্তু তাতেই তো শুধু চলে না। বেঁচে থাকার আরেকটা স্থূল এবং জৈব দিক আছে। বাঁচতে হলে খেতে হয় পরতে হয়

কিন্তু নিশিকে কে খাওয়াবে, কে পরাবে? মরার সময় যোগেন ঘর বোঝাই করে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, এমন কিছুই রেখে যায় নি, যাতে নিশ্চিন্তে তার দিন কাটতে পারে। এদিকে গুপীরও এমন রোজগার নয়, যাতে নিজের সংসার চালিয়ে নিশিকে কিছু দিতে পারে।

নিশিকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। কি করা যায়। শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বার করল গুপী। নিশিকে রোজগারের একটা পথ ঠিক করে দিল।

নয়া বসতে প্রায় বিশ ঘর জেলের বাস। তাদের ছেঁড়া জাল মেরামত করে দেবে, নতুন জাল বুনে দেবে। বাবদে যা পাবে, একজনের সংসার মোটামুটি চলে যাবে।

গুপী নিজেই ছেঁড়া জাল জোগাড় করে নিশিকে এনে দিত, তাদের কাছ থেকে মজুরির পয়সা আদায় করে দিত।

দেখেশুনে ক্ষেপে উঠত ভামিনী। শুধতো, 'তুমার মতলবখান। কী?'

গুপী বলত, 'কিসের মতলব?'

'নিশির সনগে অত মাখামাখি কেন?'

'মাখামাখি কুথায় দেখলে ? একা মেয়েমানুষ—সোমসারে কেউ নেই। এট্টু দেখাশুনো করি। মেয়েছেলে, কুথায় যাবে, কি করবে তাই মেরামতের জন্যে জাল-টাল জোগাড় করে দি। নিশির উবগার হয়। এতে দোষের কী হল ?'

'দোষ-গুণ বুঝি না। দূর ঠেঙে যত পার উবগার কর। কিন্তুক ওর কাচে যাবে না।'

নিশির কাছে তাকে যেতে বারণ করেছিল ভামিনী। গুপী শোনে নি।

উপকার করার বোধ হয় একটা নেশা আছে। সেই নেশার টানেই হয়ত বার বার নিশির কাছে যায় গুপী।

এক-একদিন ভামিনী বলত, 'তুমি নিশির কাছে যাও. আমার বড্ড ডর লাগে।'

গুপী বলত, 'কেন ?'

'মনে হয়, নিশি তুমাকে আমার কাচ থেকে কেড়ে লেবে।'

গুপী হাসত।

ভামিনী বলত, 'অমন হেসো নি। বাপের কাচে গিয়ে আমাদের বে'টা পাকা করে ফেল।'

গুপী বলত, 'আচ্ছা।'

'আজই যাও।'

'আজ না। ক'দিন পর যাব।'

ক'দিন ক'দিন করে অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। কিন্তু বিয়েটা আর হচ্ছে না।

তবে কি ভামিনী যা আন্দাজ করেছে, তা-ই ঠিক ? নিশির কাছে যেতে যেতে তার প্রাণে রং ধরেছে ? সেই জন্যেই বিয়ের ব্যাপারে সে টাল-বাহানা শুরু করেছে ? বিয়ের কথা উঠলেই এড়িয়ে যাচ্ছে ? হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনকেই শুধলো গুপী। সদুত্তর মিলল না।

এক সময় নিজের ডেরার সামনে এসে পড়ল গুপী।

ছয়

এখানে, এই সমুদ্রের মুখে টিকে থাকাই এক দুরূহ ব্যাপার।

এই প্রথম তারা মাটি পেয়েছে। কিন্তু মাটিকে দখলে রাখা কি এতই সহজ!

সমুদ্র মুখের এই ফালতু, বেওয়ারিস মাটিটুকুর কোন মালিক নেই। মালিক নেই কিন্তু দাবিদার আছে। এই দাবিদার সমুদ্র।

সবে জষ্ঠি মাসের শুরু। আউস ধানের শীষে কাঁচা সোনার রং ধরেছে। তুঁষের ভেতর সাদা দুধ ক্ষীরের মত ঘন হয়ে উঠেছে। ক্ষেতের ঝাঁপি ফসলের লাবণ্যে ভরে গিয়েছে।

আর কয়েকটা মাত্র দিন। তারপরেই ধান পুরোপুরি পেকে যাবে। কিন্তু কয়েকটা দিনের সবরও সইল না। কুবের মুরুব্বি পাকা, অভিজ্ঞ লোক। সে যা আন্দাজ করেছিল, তাই হল। সমুদ্র হাত বাড়াল। নয়া বসতের এই বেওয়ারিস মাটিটুকু গুপীদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য সে মেতে উঠল।

এতগুলি মানুষের আশা-আনন্দ এক ফুঁয়ে নিবে গেল।

নৈঋত কোণ থেকে মৌসুমী বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফুলে ফুলে গর্জে গর্জে সমুদ্র থেকে বিরাট বিরাট ঢেউ খাড়ির মুখে এসে আছাড় খেতে লাগল।

মৌসুমী বাতাসের তাড়া খেয়ে ঘন, কালো, নিরেট মেঘগুলি নয়া বসতের মাথায় এসে জমাট বেঁধে গেল। দিনরাত আকাশটাকে আড়াআড়ি ফেড়ে বিদ্যুৎ চমকায়। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে।

সমুদ্রের অথই অতল থেকে একটা গোঁ-গোঁ গম্ভীর গর্জন ঠেলে বেরিয়ে আসে। আকাশ-জোড়া বিরাট একটা মৃদঙ্গে কোথায় যেন গুরুগুরু ঘা পড়ে।

আকাশ-বাতাস ক্ষেপে উঠেছে। সমুদ্র হঠকারী হয়েছে।

সমুদ্র মুখের প্রকৃতি বিনা ভূমিকাতে হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

নয়া বসতের ঘরে ঘরে ভীত, সন্ত্রস্ত চিৎকার উঠেছে. 'হেই মা গোসানী, ঠাণ্ডা হ ঠাণ্ডা হ! মুখের গেরাস কেড়ে'লিস নি। 'ঘর বসত্ লিস নি। হেই মা।'

সমুদ্রের মারমুখী চেহারা দেখে সবাই মুরুব্বির ডেবার দিকে ছুটল। সবার মুখেই এক অসহায় জিজ্ঞাসা, 'আমাদেব কী হবে?'

কুবের বলল, 'এখুনি চল্ সব। জমিন বরাবর মাটি চাপাতে হবে। লোনা জল একবার জমিনে সেঁদুলে (ঢুকলে) ফসলেব দফা নিকেশ হয়ে যাবে। সব্বোনাশ হয়ে যাবে। চল—চল—'

মেয়ে-মরদ, জোয়ান-বুড়ো, বাচ্চা-কাচ্চা—নয়া বসতেব কেউ আব ঘরে রইল না। কোদাল আর ঝোড়া নিয়ে মুরুব্বিব পিছু পিছু খাড়িব দিকে ছুটল।

খাড়ির মুখে নোনা জল আছাড় খাচ্ছে। পাড়ের মাটি ধসতে শুরু করেছে।

মাটিতে কোপ পড়ল।

নয়া বসতেব বাসিন্দারা ধানক্ষেত বরাবব মাটিব চাঙড় ফেলতে লাগল।

সবার সঙ্গে গুপীও এসেছিল। মাটি কেটে কেটে সে ঝোড়া বোঝাই কবছিল।

ফিসফিস করে কে যেন ডাকল, 'অ্যাই গো—'

এদিক-সেদিক তাকায় গুপী। দেখল, অনেকটা নীচে যেখানে খাড়ির নোনা জল আছাড় খেয়ে গেঁজে গেঁজে উঠছে, সেখানে ঝোড়া হাতে দাঁড়িযে আছে নিশি। তার তুই ঠোঁটেব ফাঁকে একটা নিঃশব্দ, তুর্বোধ্য হাসি ধনুকেব ছিলার মত টান-টান হযে আছে।

মাজা কালো রঙ। সেই রঙ থেকে কেমন এক ধরনের চকমকানি ফুটে বেরোয়। চিকন কোমরের ওপর সুঠাম, দীঘল দেহ। চোখের কালো তারা তুটো খাঁচার পাখির মত ছটফট করছে।

নিশির ডাঁটো বয়স, আঁটো বুক।

টকটকে লাল শাড়ি পরেছে নিশি। শাড়ির লালের পাশে দেহের কালো রঙের জেল্লা ফুটে বেরিয়েছে।

এখানে আসার আগে ভরা নদী দেখেছে গুপী। এই প্রথম সমুদ্র দেখল। ভরা নদীর সঙ্গে নিশির উপমা দিতে তার মন সায় দেয় না। সমুদ্রের মতই নিশি যেন গহীন। সমুদ্রের মতই তার স্বাস্থ্য, তার যৌবন অফুরন্ত, অথই, অঢেল।

এখন সমুদ্রের দিক থেকে ক্ষ্যাপা বাতাস ছুটে আসছে। কড়-কড় শব্দে বাজ পড়ছে। বাতাসে নিশির চুল উড়ছে, লাল শাড়ির আঁচল উড়ছে এই বাজের শব্দ, ক্ষ্যাপা বাতাস, খাড়ির মুখের উথল-পাথল ঢেউ—এদের সঙ্গে নিশির কোথায় যেন আশ্চর্য একটা মিল আছে।

সর্বনেশে রূপ নিশির

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল গুপী। এই মুহূর্তে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তার। নিশির ওপর ভামিনীর খুব আক্রোশ।

গুপীর মনে হল, আক্রোশ হওয়ার মতই নিশির রূপ।

নিশির দিকে তাকালে কে বলবে, তার সোয়ামী মরেছে। সে বিধবা। সোয়ামী মরার পরও নিশি কেমন করে যে এতখানি তাজা রয়েছে, সেটাই এক রহস্য শোক-দুঃখে, কি তেই কি সে টসকায় না।

গুপী তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

নিশি বলল, 'অমন করে আমায় কি দেখচ? মনে হচ্ছে, আমায় যেন কুনকালে দেখ নি!'

'না-না—এই—'

বিব্রত গুপী তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল।

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ নিশি ডাকল, 'অ্যাই গো-

গুপী বলল, 'কী কইচ?'

'আজকাল তুমায় যে দেখতেই পাই না'।

দিন সাতেক নিশির কাছে যেতে পারে নি গুপী। নানা ধান্দায় সে ব্যস্ত ছিল। বলল, 'কাজের খুব চাপ পড়েচে। সারা রাত মাছ মারি, ভোর হবার আগে হাটে বেরিয়ে পড়ি। ফিরতে ফিরতে সেই রাত। কখন তুমার কাছে যাই বল।'

'আগে এবেলা-ওবেলা, হুবেলা আমার ওখেনে যাচ্চিলে। আজকাল যাচ্চ না। আমি ভাবলম—'

কথাটা আর শেষ করল না নিশি। চোখের তারা হুটো ঘুরিয়ে অপরূপ এক ভঙ্গি করল।

নিশির কাছে এগিয়ে এল গুপী। শুধলো, 'কী ভাবলে?'

'ভাবলম, পুরুষ বুঝি আমায় ভুলেই গেলে।'

'হেই মা গোসানী!'

অবাক চোখে কিছুক্ষণ নিশির দিকে তাকিয়ে রইল গুপী। তারপর বলল, 'তুমায় কি ভুলতে পারি? কি যে কও?'

'কইব আবার কি? খাঁটি কথাই কই।'

গুপীর দিকে একটু ঝুঁকল নিশি। গাঢ় গলায় বলল, 'আজকাল আমার কথা কি তুমার মনে রয়।'

'কেন?'

গুপী শুধলো, 'এ-কথা কইচ যে?'

'সাধে কি কইচি? আজকাল মুরুব্বির ডেরায় খুব ঘুরঘুর করচ। শুনলম—'

'কী শুনলে?'

'যা শুনেচি, তা তো তুমিও জান গো পুরুষ। সে খপব নয়া বসতের কে না জানে?'

গুপী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিশি বলতে লাগল, 'কপাল তো তোমার খুলল গো।' নিশির গলাটা কেমন যেন শোনাল।

'আমার কপালের কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

'কপাল কাটলে সবার চোখেই পড়ে যে গো। শুনলম, মুরুব্বির জামাই হতে চলেচ।'

অস্ফুট গলায় গুপী কি বলল বোঝা গেল না!

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

একসময় গুপী বলল, 'তুমাব সঙ্গে আমার অনেক কথা আচে। দু-চারদিনের ভেতব তুমার ওখেনে যাব।'

নিশি বলল, 'তুমার ইচ্চে।'

'যাব যাব, নিচ্চয় যাব। তুমাব—'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল গুপী। চোখেব ইশাবায তাকে থামিয়ে দিল নিশি। ফিসফিস, চাপা গলায় বলল, 'মুরুব্বিব বেটি।'

চমকে ঘুবে দাঁড়াল গুপী।

খানিকটা দূরে ভামিনী দাঁড়িযে বয়েছে। তাব গোল গোল ছোট চোখদুটো থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে। ক্রুদ্ধ বুকটা উঠছে নামছে। ফোঁসফোঁস করে গরম নিঃশ্বাস পড়ছে।

আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে গেল নিশি গুপী যদি তাকাত, দেখতে পেত, নিশির দুই ঠোঁটেব ফাঁকে বড় স্নিগ্ধ বড মিষ্টি একটি হাসি ফুটে বেরিয়েছে।

সাত

এখানে, এই বঙ্গোপসাগরের মুখে সব ঋতুই সমারোহ করে আসে।

সবে তো কার্তিকের শুরু। এর মধ্যেই হেমন্তের হিম-ঝরা দিনেরা এসে গিয়েছে।

সেই বিকেল থেকে কুয়াশা পড়ছে। পড়ছে তো পড়ছেই। সাদা-সাদা, হিমাক্ত কুয়াশা। এখন যতদূর তাকানো যায়, আকাশটা আবছা আবছা।

এই ঋতু অর্থাৎ হেমন্তের নিজস্ব একটি রঙ আছে। সেই রঙটি বিষাদের। এখন চারপাশ বিষণ্ণ, উদাস।

একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে

হেমন্তের দিন এমনিতেই নির্জীব। কুয়াশার দাপটে সে আরও কাবু হয়ে পড়েছে। আকাশে যে নিবু-নিবু, ভীরু আলোটুকু এখনও আটকে আছে, তার না আছে তেজ, না আছে জেল্লা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে নয়া বসতের দিকে চলেছে গগন ঢালী।

গগন গুণী লোক। ওস্তাদ গাইয়ে। তার গলাটি ভারি মিঠে।

গগন শুধু সুকণ্ঠই না। সুপুরুষও। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা লম্বা বাবরি। গোরা গোরা গায়ের রঙ। ঠোঁটে শৌখিন গোঁফের রেখা। চোখের দৃষ্টিতে কি এক অগাধ রহস্য যেন মিশে আছে।

লোকটা সর্বনেশে জাদুকর। একবার চোখ তুলে গগন যদি কারুর দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে সে তার বশ হয়ে যায়।

সুন্দর আর সুকণ্ঠ গগন। সমস্ত আবাদ জুড়ে তার খুব নাম, খুব খাতির। হ্যালিডেগঞ্জ, সুখচর, মৌভোগ—যেখানেই গানের আসর বসুক না, গগনের ডাক আসবেই। এক হাতে একটা কান চেপে আরেকটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে যখন সে গান ধরে আসর মাত হয়ে যায়।

দিন দুই আগে মাতলায় গিয়েছিল গগন। সেখানে গানের বায়না ছিল। দু-রাত গেয়ে আজ নয়া বসতে ফিরছে সে।

চলতে চলতে একবার আকাশের দিকে তাকাল গগন।

দিনের শেষ আলোটুকু মুছে যাচ্ছে। একঝাঁক সুরুলে পাখি ক্লান্ত ডানার দাঁড় টেনে টেনে কোথায় যেন চলেছে। একসময় ঘন কুয়াশার মধ্যে তারা হারিয়ে গেল।

চারদিক আবছা হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয় হয়। এখনও অনেকটা পথ বাকী। গগন আন্দাজ করল, নয়া বসতে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে।

এক পাশে বেঁটে বেঁটে কুরূপ চেহারার গেমো বন। আরেক পাশে উঁচু-উঁচু বালির ঢিবি, কন্টিকারির ঝোপ। কদাচিৎ দু-একটা রুগ্ন বাবলা। কন্টিকারির ঝোপ হলুদ ফুলে আলো হয়ে আছে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই গগনের। এখন নিজেকে নিয়ে বিভোর হয়ে আছে সে। মনটা আজ ভারি খুশি। মাতলায় পর পর ছ-আসর গেয়ে প্রচুর সুনাম হয়েছে গগনের।

কাকদ্বীপ থেকে অমূল্য চক্কোত্তি মাতলার আসরে গাইতে এসেছিল। অমূল্য নামকরা গাইয়ে। মৌভোগ থেকে এসেছিল মন্মথ বেরা। দ্বারিকনগর থেকে মহাদেব জানা। কিন্তু কেউ সুবিধে করতে পাবে নি।

আসর-ভর্তি লোক মুগ্ধ বিস্ময়ে গগনের গান শুনেছে। মাথা নেড়ে নেড়ে তারিফ করেছে। আর বলেছে, 'এই আবাদে গগন উস্তাদের জুড়ি কেউ লেই গো। অমূল্যই বল আর মন্মথই বল, কেউ তার পায়ের নোখের যুগ্যি লয়।'

চলতে চলতে গগন গুন গুন শুরু করল।

তারে না-না-না,
নারে না-না-না,
পেরাণে লেগেচে বড় ভাবনা।
তারে না-না-না,
বুকের ভেতর লুকিয়ে আচে
রূপসাগরের ঘাট।
সারা জনম খুঁজে খুঁজে
তার হদিস পেলম না
তারে নারে না-না-না—

গাইতে গাইতে গলা ছেড়ে দিল গগন। অস্থির আবেগে সুরটা কাঁপতে লাগল।

পেরাণে লেগেচে বড় ভাবনা।
না-না-না, তারে না-না-না,
আমার রূপসাগরে নাবা হল না।

একসময় রাত হল।

আজ কি তিথি, কে জানে। গেমো বনের আড়াল থেকে চাঁদ

উঠে এল। চন্দনের পাটার মত গোল [illegible]

চাঁদের আলো মিশে সব কিছুকে আচ্ছন্ন আর রহস্যময় করে তুলেছে।

হিমে মাটি ভিজে গিয়েছে। ভেজা মাটি থেকে সোঁদা-সোঁদা, মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে।

'হেই গো বাপ—হেই—'

গেমো বনের ওপাশ থেকে কে যেন ডাকল।

প্রথমে খেয়াল করে নি গগন। খুশিতে বঁদ হয়ে আছে সে। আর নিজের মনে গাইতে গাইতে চলেছে।

আবার ডাকটা শোনা গেল, 'হেই ছেলে, শুনচ—'

গান থেমে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গগন। এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু না, কারুকেই দেখা যাচ্ছে না।

'হেই গো বাপ, ইদিকে। এই গাছটার তলায়—'

গগন ঘুরে দাঁড়াল।

খানিকটা দূরে, গেমো বনের ভেতরে একটা ঢ্যাঙা চেহারার পিটুলি গাছ। ডালপালা আর অজস্র পাতায় গাছটা উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে। তার তলায় খুব অস্পষ্ট একটা মানুষের দেহের মত মনে হচ্ছে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল গগন।

ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে? পুরুষ না মেয়েমানুষ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কুয়াশার সঙ্গে চাঁদের যে আলোটুকু মিশে আছে, কোন কিছু ভাল করে বোঝার পক্ষে তা পর্যাপ্ত না।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল গগন। কাছে এসে বুঝতে পারল, পিটুলি গাছটার তলায় একটা বুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গগন শুধলো, 'তুমি কে গো?'

'আমি ভাঁট্‌নী।'

'এত রাত্তিরে এখানে কী করচ?'

'হুই উদিকে যাচ্ছিলাম।'

হাত বাড়িয়ে সমুদ্রের দিকটা দেখাল ভাঁটুনী। বলল, 'এখেনে এসে রাত হয়ে গেল। রাতকানা লোক। আঁধারে কিছু ঠাওর পাই না। কুথায় যেতে কুথায় যাব! তাই এই গেঁও বনের ভেতর সেঁদিয়ে আচি।' একটু থেমে আবার বলল, 'ভেবেছিলম, যদি কারুকে পাই, তার সনগে যাব। আর না পেলে রাতটা এখেনেই কাটাব। তা তুমি য্যাখন এসে গেছ, আমায় সনগে লিতে হবে। ফেলে যেতে পারবে নি।'

গগন বলল, 'উদিকে কুথায় যাবে? উদিকে তো সমুদ্দুর।'

'জানি গো ছেলে, জানি।'

ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'শুনিচি সমুদ্দুরের মুখে কারা যেন ঘরদোর তুলে গাঁ বসিয়েচে। তাদের ওখানেই যাচ্চি।'

'তাদের কারুকে তুমি চেন?'

'না।'

'সে কি গো! কারুকে জান না, চেন না, তবু যাচ্চ!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গগন।

ভাঁটুনী বুড়ী বলল, 'একবার গিয়ে পড়ি। চেনা-জানা হতে কতক্ষণ আর লাগবে!'

গগন মাথা নাড়ল। বলল, 'তা ঠিক।'

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ ভাঁটুনী বুড়ী শুধলো, 'তুমি তো উদিকেই যাচ্চ?'

'হ্যা—'

গগন বলতে লাগল, 'সমুদ্দুরের মুখে বন কেটে আমরাই তো গাঁ বসিয়েচি।'

'খুব ভাল হল গো। ভগমানের দয়ায় তোমায় পেয়ে গেছি। লইলে এই রাত্তিরে কি যে করতম!'

পিটুলি গাছের মাথায় একটা রাতজাগা বৈরিণী পাখি ডানা নেড়ে অন্য পাখিদের ইসারা করল। গগন আর ভাঁটুনী বুড়ী চমকে উঠল।

রাত বেড়েছে। কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। কোথাও এতটুকু

শব্দ নেই। ওপাশের উঁচু-উঁচু বালির পাহাড় আর এপাশের গেমো বন অথৈ ঘুমে তলিয়ে আছে।

গগন বলল, 'আমাদের ওখেনে তো যাচ্চ। বললে, কারও সন্‌গে চেনাজানা লেই। তা থাকবে কুথায় ?'

অবাক চোখে গগনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভাঁটুনী বুড়ী। এমন একটা বিস্ময়ের কথা এর আগে কোনদিনই সে শোনে নি। ফিস ফিস গলায় সে বলল, 'কুথায় থাকব, শুদোচ্চ ?'

'হ্যাঁ।'

'কুথায় থাকব, সে কথা ভেবে কি রাস্তায় নেবেচি !'

একটু চুপ।

ভাঁটুনী বুড়ীই আবার শুরু করল, 'সুমুদ্দুরের মুখে তুমরা গাঁ বসিয়েচ। ঘরদোর তুলেচ। সেখেনে মাথা গোঁজার এট্টু জায়গা পাব নি ?'

একটু থেমে বলল, 'দিও, তুমাদের কাচে আমায় এট্টু থাকতে দিও।'

অস্ফুট গলায় গগন কি বলল, বোঝা গেল না।

এবার ভাঁটুনী বুড়ী তাড়া দিল, 'অনেক রাত হয়েচে। লাও— চল—'

'হ্যাঁ—চল—'

বলতে বলতে সামনের দিকে পা বাড়াল গগন।

'হই গো ছেলে—'

পেছন থেকে ভাঁটুনী বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, 'আক্কেলের মাথা চোখের মাথা কি খেয়ে বসেচ—'

গগন ঘুরে দাঁড়াল। বিরক্ত গলায় বলল, 'হ'ল কী ? অমন চেঁচাচ্চ কেন ?'

'না, চেঁচাব নি ! আক্কেলখেগোর কথা শোন !'

টেনে টেনে ভাঁটুনী বুড়ী বলতে লাগল, 'আমায় একা ফেলে চলে যাচ্চ যে—'

'কুথায় ফেলে যাচ্চি ! আমার পেছু পেছু চলে এস।'

'যাই কেমন করে ! তুমায় অত করে কইলম, আমি রাতকানা

লোক। [illegible] পাই নে। তা তুমার এট্টু হুশও যদি থাকত !'

এত রাত্তিরে এই অচেনা, বুড়ো মেয়েমানুষটাকে নিয়ে কি বিপাকেই না পড়েছে গগন। বিপন্ন মুখে সে বলল, 'রাতে তুমি দিশে পাও না। তা আমি কী করব, বল—'

'কি আবার করবে। আমার হাত ধরে হাঁটিয়ে নে যাবে।'

গজ গজ করতে করতে একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল ভাঁটুনী। বলল, 'ধর—'

গগন ভাঁটুনীর হাত ধরল। বলল, 'চল—'

ছু-জনে হাটতে শুরু করল।

সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া দিয়েছে। সবে তো হেমন্তের শুরু। এর মধ্যেই বাতাসে হিমের আমেজ মিশেছে।

ভাঁটুনী ডাকল, 'হেই গো ছেলে—'

পাশ থেকে গগন সাড়া দিল, 'কী কইচ ?'

'বড্ড ঠাণ্ডা! না ?'

'হ্যা।'

'তুমার কাছে গায়ে দেবার কিছু আচে ?'

'না।'

আর কিছু বলল না ভাঁটুনী বুড়ী। পরনের কাপড়টাকে সারা দেহে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নিল।

এখন কত রাত, কে বলবে।

সামনে-পেছনে, যতদূর তাকানো যায়, অথৈ কুয়াশা। সেই কুয়াশা বিঁধে ঠিকমত নজর চলে না।

অনেকক্ষণ ছু-জনে হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে সেই গেরুয়া নদীটার কাছে এসে পড়ল। নদীর পাব ধরে আর খানিকটা গেলেই তারা নয়া বসতে পৌছে যাবে।

এর মধ্যে একটা কথাও বলে নি কেউ। না ভাঁটুনী, না গগন।

হঠাৎ গগন ডাকল, 'শুনচ ?'

'কা ?' ভাটুনা বুড়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

'একটা কথা শুদোব ?'

'শুদোও।'

'কুথা ঠেঙে আসচ ? তুমার ঘর কুথায় ?'

'সব কইব। আগে তুমাদের ওখেনে গিয়ে পড়ি।'

ভাট্নী বুড়ী বলতে লাগল, 'তা-পর কুথা ঠেঙে এলম, কেন এলম, সব কইব। কিচ্ছু লুকোব নি। য্যাতক্ষণ না পৌঁচচ্চি, এট্টু সবুর করে থাক।'

গগন আর কিছু বলল না।

এক সময় তারা নয়া বসতে পৌঁছল।

এখানে অজস্র, অফুরন্ত, উচ্ছ্বসিত বাতাস।

বঙ্গোপসাগর থেকে নোনা বাতাস ছুটে আসছে। নয়া বসতের ঝুঁটি ধরে ইচ্ছেমত নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছে।

নয়া বসত এখন নিঝুম, নিস্তব্ধ।

কেউ জেগে নেই। কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে সমুদ্রমুখের এই নগণ্য জনপদটা ঘুমে অসাড় হয়ে আছে।

গগন বলল, 'সবাই দেখচি ঘুমিয়ে পড়েচে। এত রাতে কাকে আর ডাকব ?'

ভাট্নী বুড়ী চুপ করে রইল।

গগন আবার বলল, 'বাকী রাতটুকু আমার ঘরেই কাটিয়ে দাও। কাল সকালে যা হোক একটা ব্যাবোস্থা করা যাবে।'

'তাই ভাল।'

ভাট্নী বুড়ী মাথা নেড়ে সায় দিল।

ভাট্নীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ডেরার দিকে চলল গগন। চলতে চলতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

কুয়াশায় ভাট্নীর মুখটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। নাক-চোখ-গাল-কপাল, আলাদা আলাদা ভাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ভাটুনী নামে এই বুড়ো মেয়েমানুষটা কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কিছুই জানে না গগন। সমুদ্রের মুখে তাদের নয়া বসতে সে একটু আশ্রয় চায়। ভাটুনীর মনে কী আছে কে জানে ?

নিজের চারপাশে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মলাট এঁটে গগনের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে ভাটুনী।

আট

বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিনের প্রথম রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। এক কোণে একটা মাকড়সা জাল বনেছিল। রোদ লেগে জালের ফিনফিনে সুতোগুলো সোনার তারের মত চিকমিক করছে।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল কুবের সাঁইদার। আজ আর হাটে যায় নি সে।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, 'হেই গো মুরুব্বি—'

অস্পষ্টভাবে ডাকটা কানে এল। কুবের জাগল না। বিড় বিড় করতে করতে পাশ ফিরে শুল।

'হেই মুরুব্বি, ওঠ। ঢের বেলা হল।'

সমানে ডাকাডাকি করছে।

কুবের ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল কিন্তু কুবের উঠল না। কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েই রইল। কাঁথার ভেতর তরল অন্ধকার, উষ্ণ আরাম। হেমন্তের এই সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

'মুরুব্বি- শুনচ—'

না, হেমন্তের সকালের আরামটুকু কুবেরের বরাতে নেই। কাঁথা সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল সে। বিরক্ত, কর্কশ গলায় বলল, 'ভোরবেলা চেল্লাচেল্লি কচ্চিস, কে রে ?'

বাইরে থেকে জবাব এল, 'ভোর কুথায় গো! কী কইচ মুরুব্বি! এক পহর বেলা চড়ে গেচে!'

'কে রে নচ্ছারের ব্যাটা?' কুবের খিঁচিয়ে উঠল। ঘুম ভাঙাতে ভীষণ চটেছে সে।

'নচ্ছারের ব্যাটা লয়, আমি গগন।'

'কে—'

এবার কুবেরের গলায় সমীহভাব ফুটে বেরুল, 'উস্তাদ না কি গো?'

'হ্যাঁ।'

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল কুবের। ঘুম ছুটে গিয়েছে। কিন্তু জড়তা এখনও কাটে নি। জড়তা কাটাবার জন্য আড়মোড়া ভাঙল সে। শুধলো, 'মাতলা ঠেঙে কখন ফিরলে গো উস্তাদ?'

গগন যে মাতলায় গাইতে গিয়েছিল, এখবর নয়া বসতের সবাই জানে।

গগন বলল, 'কাল মাঝ-রাত্তিরে।'

'তা মাতলায় গানের আসর কেমন জমেছেল?'

'খুব ভাল।' সংক্ষেপে জবাব সেরে গগন বলল, 'মাতলার কথা পরে শুনো। এখন তুমার কাচে একটা দরকারে এসেচি।'

'কী দরকার?'

'কইচি।'

একটু দূরে ভাঁটুনী বুড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণ খেয়াল করে নি কুবের। হঠাৎ তার নজর পড়ল। অবাক চোখে একটুক্ষণ ভাঁটুনীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর শুধলো, 'সক্কালবেলা এ কাকে লিয়ে এসেচ গো উস্তাদ!'

'লোতুন মানুষ।'

'তা তো দেখতেই পাচ্চি।'

কুবের সাঁইদার বলতে লাগল, 'একে পেলে কুথায়?'

'হুই রাস্তার ধারে, গেঁও বনের ভেতর। কাল রাত্তিরে মাতলা ঠেঙে ফিরছিলম—'

কাল রাত্রে কোথায় কেমন করে ভাঁটুনী বুড়ীকে পেয়েছে, আগাগোড়া সব বলল গগন।

একটু চুপ।

বেলা অনেকটা চড়েছে। রোদের তাত বাড়তে শুরু করেছে। সমুদ্র থেকে অশান্ত বাতাস ছুটে আসছে।

দিনের বয়স বাড়ছে।

এই হেমন্তে উত্তর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এখানে উড়ে আসে। অযুত, অর্বুদ, অসংখ্য পাখি। এই পাখিদের নাম যে কী, কেউ জানে না।

উত্তরে কোথাও যেন একটা বরফের পাহাড় আছে। এই পাখিদের বাস নাকি সেখানে। হেমন্তের শুরুতে বরফের দেশের পাখিরা সমুদ্রের দেশে চলে আসে। হেমন্ত আর শীত—পুরো দুটো ঋতু তারা এখানে থাকবে। এখানকার আকাশকে জমকালো করে রাখবে। তারপর বছরের শেষ ঋতুটি আসার আগেই ফিরে যাবে।

পাখিরা উড়ছে। দুই ডানা মেলে হাওয়ার সমুদ্রে তারা দাঁড় টানছে।

গগনই আবার শুরু করল, 'একটা কথা মুরুব্বি—'

'বলে ফেল।' কুবের বলল।

ভাঁটুনী বুড়ীকে দেখিয়ে গগন বলল, 'এর জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে মুরুব্বি।'

'কী ব্যবোস্থা ?'

জিজ্ঞাসু চোখে গগনের মুখের দিকে তাকাল কুবের।

'এ আমাদের এখেনকার বাসিন্দে হতে চায়।'

এবার ভাঁটুনী বুড়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কুবের। শুধলো, 'তাই না কি গো ?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে ভাঁটুনী সায় দিল।

'আমাদের এখেনকার খপর তুমায় কে দিল ?'

কি একটু ভাবল ভাঁটুনী। মনে মনে কি যেন ভেঁজে নিল।

তারপর শুরু করল, 'মাথা গোঁজার এট্টু ঠাঁইয়ের জন্যে এখেনে-ওখেনে ঘুরে মরছিলম। সিদিন কাকদ্বীপের বাজারে এসে শুনলম, সমুন্দুরের মুখে কারা যেন লোতুন গাঁ বসিয়েচে। আশায় আশায় ইদিকে হাঁটতে শুরু করলম।'

'ও-' অস্ফুট একটা শব্দ করল কুবের সাঁইদার।

ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'বড্ড আশা করে এসেচি গো ছেলে। এত বড় পিবথিমীতে আমার থাকার মত এট্টু জায়গা লেই। তুমাদের এখেনে যদি ঠাঁই না পাই—' কথাটা শেষ করল না ভাঁটুনী। বলতে বলতে থেমে গেল।

ভাঁটনীর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাল কুবের। বলল, 'সত্যি এখেনে থাকতে চাও ?'

'হ্যা গো ছেলে, হ্যা—'

'কিন্তুক এখেনে যে বড্ড কষ্ট !'

অল্প একটু হাসল ভাঁটুনী। বলল, 'কষ্টের কথা কইচ ! তিন কুড়ি বয়েস হল। এর ভেতর সুখের মুখ কবে আর দেখলম ! সব্বো জন্ম কষ্টে কষ্টেই কাটল। কষ্ট আমার কপালেক লেখা।'

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ কুবের বলল, 'তুমি এখেনে থাকবে, নয়া বসতে একজন লোতুন বাসিন্দে বাড়বে, এ তো ভাল কথা। কিন্তুক—'

'কিন্তুক কী ?' উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভাঁটুনী।

'ত্যাখ বুড়ী মেয়েছেলে, আমি এখেনকার মুরুব্বি। কথাটা ঠিক। কিন্তুক তুমার এখেনে থাকতে হলে আমার একার মতেই তো চলবে নি। সবার মত চাই।'

বিড় বিড় করে ভাটুনী বুড়ী কি বলল, বোঝা গেল না।

'তা ছাড়া, এখেনে কার সোমসারে তুমায় রাখবে, কে তুমার দায় লেবে—সে সব ঠিক করতে হবে।' কুবের বলল, 'এখন তো ও সব হবে নি। সবাই হাটে চলে গেচে।'

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল গগন। এতক্ষণ ভাঁটুনী

আর কুবেরের কথা শুনাছিল। এবার সে মুখ খুলল, 'তা হলে মুরুব্বি—'

'হুঁ—' গগনের দিকে তাকাল কুবের।

'কখন এর ব্যবোস্থা করবে?'

'সনঝে বেলা। সবাই হাট ঠেঙে ফিরে এলে।'

'এখন তবে এক্কে লিয়ে যাই।' গগন বলতে লাগল, 'সনঝে বেলা হু বাব আসব।'

'আচ্ছা।' কবের মাথা নাড়ল।

ভাটুনীকে নিয়ে গগন চলে গেল।

সন্ধার মুখে মুখে আবাদের হাট থেকে সবাই ফিরে এল। সাঁইদারের ডেরার সামনে ভিড় জমল।

সবাই এসেছে। বিলেস, কঞ্জ, গুপী, নটবর—কেউ বাদ নেই।

তিন কোণে তিনটে মশাল জ্বলছে।

সবার মাঝখানে বসেছে কবের মুরুব্বি। তার পাশে ভাটুনী বুড়ী আর গগন।

খুক খুক করে কবের একটু কাশল। চারপাশের মানুষগুলো উদগ্রীব হয়ে রইল।

কুবের শুরু করল, 'তুমাদের সনগে একটা পরামোশ্য (প ' মর্শ) আচে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, 'কিসের পরামোশ্য?'

'কাল রাত্তিরে উস্তাদ একজন লোতুন মানুষ এনেচে। সে আমাদের এখেনে থাকতে চায়।'

'লোতুন মানুষ? কুথায়?'

'এই তো। আমার কাচে বসে রয়েচে।' কুবের ভাটুনী বুড়ীকে দেখাল।

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করে নি। এবার অনেকগুলো উৎসুক চোখ এসে পড়ল ভাটুনী বুড়ীর ওপর। একদৃষ্টে সবাই তাকে দেখতে লাগল।

ভাঁটুনীর তামাটে মুখে মশালের আলো পড়েছে। উগ্র লালচে আলো।

মুখটা রেখায় রেখায় জটিল। গালের মাংস ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। পাটের ফেঁসার মত রুক্ষ, জটাপাকানো চুল। কতকাল যে ভাটুনীর মাথায় তেল পড়ে নি! চোখদুটো ঘোলাটে। পাকা ভুরু। দু-পাটিতে কোনক্রমে গোটা পাঁচেক নড়বড়ে দাঁত টিঁকে আছে।

ভাঁটুনীর মুখে বয়স তার শীলমোহর এঁটে দিয়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! তার শরীরের দিকে তাকালে ধাঁধা লেগে যায়। অফুরন্ত স্বাস্থ্য, দেহের বাঁধুনি অটুট। চামড়া এতটুকু কোঁচকায় নি পর্যন্ত। মজবুত, নিরেট চেহারাটার দিকে তাকালে মনে হয়, ভাঁটুনীর বয়স তিরিশ।

ভাঁটুনীর বয়স এক রহস্য। মুখ দেখলে মনে হয়, ষাট। স্বাস্থ্য দেখলে তিরিশ।

রেখাজটিল মুখ আর পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যের গোলকধাঁধায় আসল বয়সটাকে লুকিয়ে রেখেছে ভাঁটুনী।

বিলেস বলল, 'লোতুন মানুষটাকে উস্তাদ পেল কুথায়, হ্যা গো মুরুব্বি?'

কুবের বলল, 'কাল রাত্তিরে হুই গেঁও বনের ভেতর—'

কথার ধরনে সবাই হেসে উঠল।

বিব্রত মুখে কুবের বলতে লাগল, 'হাসির কথা লয়। পুরো কথাটা আগে শুনেই লাও।'

ভাঁটুনী বুড়ীকে কোথায় কেমন করে গগন ওস্তাদ পেয়েছে সব বলল কুবের।

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ একজন শুধলো, 'লোতুন মানুষের ঘর কুথায়?'

এবার ভাঁটুনী জবাব দিল, 'আমার ঘর লেই।'

'সে কি গো? সত্যি কইচ?'

অবাক বিস্ময়ে সবাই ভাঁটুনীর দিকে তাকাল।

ভাঁটুনী বলল, 'সত্যি কইচি বাবারা। ভগমানের নামে দিব্যি করে কইচি। আমার ঘর লেই।'

'ঘর লেই তো এদ্দিন ছিলে কুথায় ?'

'এখেনে-ওখেনে-সেখেনে। যে যেখেনে থাকতে দিয়েচে, সেখেনেই থেকেচি। আবার য্যাখন দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েচে, পথে নেবে পড়েচি।'

একটু থামল ভাঁটুনী বুড়ী। ঘন ঘন শ্বাস টানল। আবার শুরু করল, 'মাথা গোঁজার এট্টু ঠাঁইয়ের জন্যে সারা জন্ম ঘুরে মরচি। শেষ পয্যন্ত তুমাদের এখেনে এসে পড়েচি।'

বিলেস শুধলো, 'পিরথিমীতে এত জায়গা থাকতে এই সুমুদ্দুরের মুখে এলে যে—'

'কেন এলাম, সব কইব।' ভাঁটুনী বুড়ী বলতে লাগল, 'তার আগে দু-চারটে অন্য কথা শুনে লাও।'

'বল।'

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। প্রচুর কুয়াশা পড়েছে। সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস ছুটে আসছে। উদ্‌ভ্রান্ত, এলোপাথাড়ি বাতাস। এই রাত্রিবেলা বঙ্গোপসাগরের বাতাসকে নিশিতে পেয়েছে।

খাড়ির পারে বিরাট বিরাট, পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ অবিরাম আছাড় খাচ্ছে। সমুদ্র শাসাচ্ছে। গজরাচ্ছে। এখান থেকে তার শাসানি আর গজরানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

এখানে, এই বঙ্গোপসাগরের মুখে সব সময় একটা জলসার আসর বসে আছে। সে আসরে সমুদ্র মূল গাইয়ে। নিশি-পাওয়া, খ্যাপাটে বাতাস তার সঙ্গে সঙ্গত ধরেছে।

কখন যেন একটা মশাল নিবে গিয়েছে। কারও হুঁশ নেই। বাকী দুটোকে ঘিরে গুঁড়ো গুঁড়ো হিম উড়ছে।

আকাশে হয়ত চাঁদ আছে। হয়ত নেই। কুয়াশার জন্য ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না।

কুবেরের ডেরা থেকে খানিকটা দূরে ধানের ক্ষেত। তারপর

একটানা তরা গাছের ঝোপ। ঝোপ পেরিয়ে বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ির পর সমুদ্র।

এখন কিছুই দেখা যায় না। কিছুই বোঝা যায় না। ঘন কুয়াশার একটা পর্দা খাড়া নেমে এসে সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধান ক্ষেত, ঝোপ, বালিয়াড়ি, সমুদ্র—এখন সব কিছু নিরাকার, নিরবয়ব।

ভাঁটুনী সামনের দিকে তাকাল। সামনে অথৈ কুয়াশা। কুয়াশার ওপারে অনেক, অনেক দূরে কি যেন খুঁজতে লাগল

কী খুজছে ভাঁটুনী?

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন তাড়া লাগাল, 'কি গো লোতুন মানুষ, মুখে কুলুপ এটে রইলে যে! কিছু বল—'

ভাঁটুনী মুখ ফেরাল না। বিরক্ত, কর্কশ গলায় খেঁখিয়ে উঠল, 'কইচি বাপু, কইচি। কথাগুলোনকে মনের ভেতর গুছিয়ে লিতে দাও।'

এরপর খানিকটা চুপচাপ।

রাত-অন্ধ, অথর্ব চোখে সামনের দিকে তাকিয়েই আছে ভাঁটুনী! খুব সম্ভব সে তার অতীতকে খুঁজছে।

স্মৃতির ভেতর আতিপাঁতি করে খুজল ভাঁটুনী। কিন্তু না, জীবনের শুরুটাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

কত বয়স হয়েছে ভাঁটুনীর? পঞ্চাশ? ষাট? না তারও বেশী? নিজের সঠিক বয়স ভাঁটুনী জানে না।

জীবনের শেষ মাথায় পৌঁছে পেছন ফিরে তাকিয়েছে সে! অনেক দূরের আরেকটা প্রান্ত ধূ-ধূ হয়ে গিয়েছে। এত দূর থেকে তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

জীবনের প্রথম দিকটার কথা একেবারেই মনে করতে পারে না ভাঁটুনী। শুধু প্রথম দিকটাই নয়, মাঝখানের অনেক কথা অনেক ঘটনা অনেক খেই হারিয়ে গিয়েছে।

বার বার একটা পথের কথা মনে পড়ছে ভাঁটুনীর। পথটা

ঝড়, কর্দম, ভাঙাচুরা। সেখানে পায়ে পায়ে বাঁক, পায়ে পায়ে টক্কর। সেখানে পা ফেললে চড়াই, পা ফেললে উতরাই।

সারা জীবন সেই পথটার ওপর দিয়ে হাঁটছে ভাঁটুনী। চড়াই-উতরাই ভেঙে, এলোপাথাড়ি ঝড়ঝাপটা খেতে খেতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে সে। জীবনেরই শুধু নয়, বাংলা দেশের শেষ সীমান্তে একেবারে বঙ্গোপসাগরের মুখে এসে পড়েছে।

এমন একটা পথ কোথাও কি আছে? আছে। জন্মাবধি পথটা ভাঁটুনীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কোনদিন তাকে সুস্থভাবে নিশ্চিন্তে একটা পা-ও ফেলেত দিচ্ছে না। যতদিন সে বাঁচবে, পথটা বুঝি তার সঙ্গ ছাড়বে না। পথটা তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

চারপাশে নয়া বসতের মানুষগুলো উন্মুখ হয়ে বসে আছে। আগ্রহে তাদের মুখচোখ চকচক করছে।

এদের কাছে নিজের জীবনের কথা বলবে ভাঁটুনী। বলবে তো, শুরু করবে কোথা থেকে।

ভাঁটুনীর জীবন এমন নয় যা নিয়ে অহঙ্কার করা চলে। গর্ব করা চলে। জীবনে গ্লানি ছাড়া তার কোন পুঁজি নেই।

যেখান থেকেই শুরু করুক, গ্লানির কথা এসে পড়বেই।

একসময় ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'কুথায় কোন লরকে জন্মে-ছিলম, জানি না। কে আমার বাপ, কে আমার মা তাও জানি না। জন্মেরই আমার ঠিক নেই।'

ভাঁটুনীর গলাটা কাঁপছে, 'য্যাখন ছোট ছিলম, অজ্ঞান ছিলম, ত্যাখনকার কথা কইতে পারব নি। য্যাখন এট্টু বড় হলম, জোয়ান হয়ে সব বুঝতে শিখলম, ত্যাখন দেখি শ্যাল-কুকুরের ছানার মত এর দোরে ওর দোরে ঘুরে বেড়াচ্চি।'

ভাঁটুনী থামল না। কাঁপা-কাঁপা, অস্থির গলায় বলে যেতে লাগল, 'দু-মুঠো ভাত আর মাথা গোঁজার এট্টু ঠাঁইয়ের জন্যে কী না করেছি।'

জন্ম হচ্ছে মা-বাপের ইচ্ছায়। তার ওপর মানুষের হাত নেই। যদি থাকত, ভাঁটুনী কি করত কে জানে।

জন্মের দিক থেকে কোন গৌরবই নেই অহঙ্কার। বাপ-মার কাছ থেকে একটা প্রাণ ছাড়া আর কিছুই আদায় করতে পারে নি সে। কিছুই না। বুক ফুলিয়ে মাথা তুলে বলার মত একটা সামাজিক পরিচয় পর্যন্ত তার নেই। শিরায় শিরায় কার রক্ত বয়ে বেড়াচ্ছে, ভাঁটুনী জানে না।

পিতৃপরিচয়হীন একটা প্রাণ তার ভেতর বাসা বেঁধে আছে। আশ্চর্য! প্রাণটার প্রতি এতটুকু বিতৃষ্ণা নেই। সামান্য বিরূপতা পর্যন্ত না। সেটাকে বাঁচাবার জন্য জন্মাবধি এর ঘরে তার ঘরে মাথা গুঁজেছে ভাঁটুনী।

হাজার জাতের মানুষের অন্নে তার দেহ পুষ্ট হয়েছে। তার প্রাণ বেঁচেছে।

ভাঁটুনীর জন্য স্থায়ী আশ্রয় কোথাও নেই। এক জায়গায় ক'দিনই বা সে টিকতে পেরেছে! দু-দিন, দশদিন, জোর মাস-খানেক। তারপরেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভাঁটুনী বলল, 'ভগমান কপালে কি আঁক কেটেছে, সে-ই জানে।' যেখেনেই গেচি, যার ঘরেই উঠেচি, শুধু লাথি আর ঝ্যাটো জুটেচে।"

মানুষের কাছ থেকে অবজ্ঞা আর অবিচার, তাড়া আর খেদানি ছাড়া সারা জীবন আর কিছুই পায় নি ভাঁটুনী। কোনদিন কেউ তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি। ভাল মুখে কেউ একটা কথা পর্যন্ত বলে নি।

একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ভাঁটুনী। ঘোলাটে চোখ দুটো ধকধক করছে। নিজের জীবনের কথা বলতে বলতে কি এক যন্ত্রণায় তার মুখটা বার বার কুঁচকে যাচ্ছে।

জীবনের প্রথম তের চোদ্দটা বছর একরকম কেটেছিল। তারপরেই বিপদ হল।

জন্ম দিয়েই বাপ-মা ফেলে পালিয়েছিল। কোনদিন তার খোঁজ করে নি! বাপ-মা না করুক, সময় কিন্তু ভাঁটুনীর খোঁজ রেখেছিল। সে তার কর্তব্য করে যাচ্ছিল।

এতদিন যৌবন তার পিছু পিছু আসছিল। ভাঁটুনী টের পায় নি। যেই সে পনেরয় পা দিল, যৌবনও তাকে ধরে ফেলল।

কোনদিন খাওয়া জুটত, কোনদিন জুটত না। মাথায় তেল পড়ত না। চুলে চিরুনি না। নিজেকে একটু যত্ন পর্যন্ত করত না ভাঁটুনী। পরের অন্নে পরের দয়ায় আপনা থেকেই দেহটা যতখানি বাড়তে পারে, বাড়ুক। তার বেশি দরকার নেই। নিজের শরীরের প্রতি এতটুকু মোহ ছিল না ভাঁটুনীর।

তবু ঢল নামল। পনের বছরের দেহ ভাদ্রের অথৈ নদী হয়ে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে বুকটা থর থর করে কাঁপত ভাঁটুনীর। সে ভেবে পেত না, দেহভরা এত যৌবন নিয়ে সে কোথায় যাবে, কি করবে!

যৌবন যদি তাকে রেহাই দিত, ভাঁটুনী বেঁচে যেত। এতদিন যেমন চলছিল, তেমনই চলত। লোকের বাড়ি ঘুরে পাতকুড়নো খেয়ে খেয়ে তার জীবন কেটে যেত। কিন্তু তা হল না।

জন্মের ইতিহাস যত নোংরাই হোক, বাপ-মা'র হদিস নাই থাক, তবু সে মেয়ে। যুবতী মেয়ে।

এতদিন ভাঁটুনীর দিকে কারও নজর ছিল না। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সবাই সচেতন হল।

আগলে রাখবার কেউ নেই। কেউ বাধা দেবে না। সুযোগ পেয়ে হাজাবটা মাংসাশী শকুন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতদিন যৌবন ছিল, ভাঁটুনীকে নিয়ে টানাটানি, কামড়া-কামড়ি চলল। লুটের মালের মত যে পেল সে-ই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল।

একদিন যৌবন গেল। শকুনগুলো তাকে ছেড়ে অন্য ভাগাড়ের দিকে চলে গেল। তারপরও বেঁচে রইল ভাঁটুনী।

যতদিন যৌবন ছিল, খাওয়ার ভাবনাটা অন্তত ছিল না। ভাঁটুনী অকৃতজ্ঞ নয়। তার স্পষ্ট মনে আছে, শকুনগুলো তাকে পেট পুরে খেতে দিত।

যৌবন যাবার পর দুঃসময় এল। এখন আর কেউ তাকে আশ্রয়

দিতে চায় না। খেতে দিতে চায় না। তার কাছে কিছু পাবে না, অথচ দিয়ে যাবে, এমন মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছে!

ভাঁটুনী কিন্তু দমল না।

প্রথম প্রথম সে হাত পাতত। কিছু না পেলে গালাগাল দিত। জোর করে আদায় করত। তাকে বাঁচতে হবে তো!

যৌবন যাবার পরও পনের কুড়িটা বছর সে বেঁচে আছে।

এখন কত রাত, কে বলবে।

মশাল ছুটো ঝিমিয়ে পড়েছে। চারপাশ থেকে ঘন কুয়াশা তাদের ঘিরে ধরেছে। একটু পরেই তারা অন্ধ হয়ে যাবে।

ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'সারা জীবন ঘুরে মরচি। ডায়মন-হাবরা (ডায়মণ্ডহারবার), কুলপী, নামখানা, দ্বারিকলগর, শ্যামপুর —কত জায়গায় না ঘুরলম। সব জায়গার নামও মনে নেই।'

একটু থেমে আবার বলল, 'কুথাও থিতু হয়ে বসতে পাবলম নি। ছু-দিন চার-দিনের বেশি কেউ থাকতে দিল নি।'

ভাঁটুনীর গলাটা ধরা ধরা শোনাল, 'অনেক বয়েস হল, আজকাল আর ঘুরতে পারি না। শরীলটা বড্ড কাবু হয়ে পড়েচে।'

ভাঁটুনী থামল।

সমুদ্রের গজরানি আব বাতাসের শাসানি ছাড়া এখন কোন শব্দ নেই।

ফুসফুস ভরে বঙ্গোপসাগরের হাওয়া টেনে নিল ভাঁটুনী। রাত-অন্ধ চোখে নয়া বসতের মানুষগুলোর দিকে একবার তাকাল। তারপর শুরু করল, 'অনেক কথাই তো শুনলে। এবেরে শেষ কথাটা বলি।'

'বল'।— পাশ থেকে কুবের বলল।

ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'পিরথিমীর কুথাও আমার জন্যে এট্টু ঠাঁই লেই। হেই গো বাবারা, অনেক আশা লিয়ে তুমাদের কাচে এইচি।'

বিড় বিড় করে কুবের কি বলল, বোঝা গেল না।

ভাঁটুনী থামল না, 'বেশিদিন আর বাঁচব নি। যে কটা দিন বাঁচি তুমাদের এখেনে থাকতে দাও।'

ভাঁটুনীর কথা শেষ হল। নিজের জীবনের সমস্ত কথাই সে বলেছে। কিছুই লুকোয় নি।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

কেউ কথা বলছে না। কুবের না। গগন না। ভাঁটুনী না। কেউ না। বলার মত একটা কথাও তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

মশালের নিবু-নিবু আলোতে নয়া বসতের মানুষগুলো আচ্ছন্নের মত বসে রইল। ভাঁটুনী বুড়ীর দুঃসহ জীবনটার কথা শুনতে শুনতে তারা অভিভূত হয়ে গিয়েছে।

অভিভূত ভাবটা কুবেরই প্রথম কাটিয়ে উঠল. আস্তে আস্তে সে বলল, 'সব কথা তো শুনলে। এখন বল, তুমাদেব মত কী?'

'কিসের মত?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা গলা শোনা গেল।

'লোতুন মানুষটা আমাদেব এখেনে থাকতে চাইচে তুমাদের আপত্তি লেই তো?'

সবাব মুখের ওপব দিয়ে লাল লাল ভাঁটার মত চোখদুটো ঘুরিয়ে নিয়ে গেল কুবেব।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'না-না, কোন আপত্তি লেই।'

আপত্তি কেনই বা থাকবে?

নয়া বসতের মানুষগুলোব জীবন আব ভাঁটুনীর জীবন হুবহু এক। কোন তফাত নেই। এই নতুন মানুষটাব সঙ্গে সব দিক থেকেই তাদেব আশ্চর্য মিল।

সামান্য একটু মাটির জন্য কত কাল তারা ঘুরে মরেছে। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে মাটি মিলেছে। একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়েব খোঁজে ভাঁটুনীও জন্মাবধি ঘুরছে।

সমুদ্রের মুখে, এই নির্ভূম মানুষের উপনিবেশে ভাটুনা ঠাঁই না পায়, তবে কোথায় পাবে !

নয়া বসতে এসে বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়েছে ভাঁটুনীর। এই মুহূর্তে সেই অভিজ্ঞতার কথাটাই ভাবছে সে। যত ভাবছে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

এতকাল যেখানেই গিয়েছে, জাতজন্মের কথা উঠলেই তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যার জাতের ঠিক নেই, জন্মের ঠিক নেই, তার নিশ্বাসে পাপ, সংসর্গে পাপ।

আজীবন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে একটা মাত্র জিনিস আদায় করতে পেরেছে ভাঁটুনী। তা হল ঘৃণা। নিষ্ঠুর, সীমাহীন ঘৃণা।

ভাঁটুনীর কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, জগতের কাছে ঘৃণা ছাড়া তার কোন প্রাপ্য নেই।

আশ্চর্য ! সব শুনেও এখানকার মানুষগুলো তাকে ঠাঁই দিল জাতজন্মের মত একটা গুরুতব বিষয় গ্রাহ্যই করল না।

ভাঁটুনী জানে না, এতদিন যেখানে সে ঘুরছিল, তার সঙ্গে নয়া বসতের কোন মিলই নেই। তাব পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে সমুদ্রমুখের এই উপনিবেশ।

যেখানে জাতজন্মের মত একটা সাজ্ঘাতিক ব্যাপার নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না, সেখানকার জীবন কি অসামাজিক ? এর উত্তব ভাঁটুনী জানে না।

সবেমাত্র এসেছে ভাঁটুনী। নয়া বসতের কোন স্বরূপই তার জানা হয় নি।

পাশ থেকে গলার খাঁকরি দিল কুবের। ভাঁটুনী চমকে উঠল। কুবেব খেয়াল করল না। নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'আমাদের এখেনে একটা লোতুন মানুষ বাড়ল। ভাল কথা। খুব ভাল কথা। কিন্তুক সে থাকবে কুথায় ? কে তাকে রাখবে ?'

এ কথাটা তো কেউ ভাবে নি। এতক্ষণ ভাঁটুনীর দুঃখে সবাই

অভিভূত হয়ে ছিল। কিন্তু কে তার দায় নেবে, নিজেব সংসারে কে নিয়ে তুলবে, এই বাস্তব দিকটার প্রতি কারও লক্ষ্য ছিল না।

হাজার হোক, কুবের তাদের মুরুব্বি। সব দিকেই তাব নজর।

অনেকক্ষণ আগেই কুবের তাব কথা শেষ করেছে। কিন্তু কেউ জবাব দিচ্ছে না। মানুষগুলো চুপচাপ বসে আছে।

হঠাৎ কুবের ডাকল, 'হেই গো পাঁচু—'

ভিড়েব মধ্যে থেকে পাঁচু নামধারী লোকটা উঠে দাঁড়াল। গোলগাল, বেঁটেখাটো চেহারা। সে বলল, 'কী কইচ মুরুব্বি?'

'লোতুন মানুষটাকে তুমাব সোমসারে লিয়ে লাও না।'

মুখ কাঁচুমাচু কবে পাঁচু বলল, 'তুমি তো সবই জ ন মুরুব্বি। আমাব সোমসাবে কতগুলোন পুষ্যি! তাব ওপবে অ রেকজনের দায যদি চাপে, সামলাতে পাবব নি।'

কুবেব বলল, 'কথাটা ঠিকই কযেচ। না, তুমাব ওপব চাপানো চলবে নি।'

পাঁচু বসে পড়ল।

এবাব কুঞ্জব দিকে নজব পড়ল কুবেবেব। সে বলল, 'লোতুন মানুষটাকে তবে তুমিই লাও।'

কুঞ্জ বলল, 'লোব তো, থাকতে দোব কুথায? কাচ্চাবাচ্চা লিযে আমবা দশজন। ঘব তো মোটে একখানা। নিজেদেরই থাকাব কত কষ্ট! তাব ওপব—' শেষ না কবেই কুঞ্জ থামল।

কুবেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, 'বুঝলম, তুমাকে দিয়ে হবে নি।'

একে একে সবাইকে বলল কুবেব। কিন্তু কেউ বাজী হল না।

বাড়তি একটা মানুষের দায়িত্ব কেউ নিতে চায না।

হঠাৎ কুবেরেব নজর পড়ল, এক কোণে গুপী বসে আছে। দুই হাঁটুব ফাঁকে থুতনি রেখে ঢুলছে।

কুবেব ডাকল, 'গুপী—হেই গুপী—'

গুপী ধড়মড় করে উঠল। ঘুম-ঘুম, জড়ানো গলায় বলল, 'কী হল?'

'আমার দিকে চা।'

গুপী চোখ রগড়াতে লাগল। একটু পরেই ঢুলুনি ভাবটা কেটে গেল। সে শুধলো, 'ডাকছেলে কেনে?'

'এই লোতুন মানুষটার দায় তুই নে।'

কুবের বলতে লাগল, 'তোর সোমসারে তো কোন মেয়েছেলে লেই। মোটে তোরা দুটো ভাই। এ বেশ ভালই হল। মাথার ওপর মায়ের মতন একজন রইবে। তোদের রাঁধাবাড়া করে দেবে। দেখাশুনো করবে। সোমসারটাকে আগলে আগলে রাখবে। কি কোস (বলিস) হেই রে—'

'এর ভেতর কওয়া-কওয়ির কি আচে। তুমি মুরব্বি, তুমি য্যাখন্ কইচ, বুড়ীকে আমি লিলম।'

গুপী একটা হাই তুলল।

জীবনে এই প্রথম স্থায়ী আশ্রয় পেল ভাঁটুনি। সে কি জানত, নির্ভূম মানুষের এই উপনিবেশটা তার জন্য দুহাত বাড়িয়ে ছিল?

কৃতজ্ঞতায় ভাঁটুনীর দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

নয়া বসতের জীবনলীলায় একটি নতুন মানুষ বাড়ল।

নয়

এত রূপ দিয়ে মানুষ কী করে; যদি মুগ্ধ চোখে কেউ চেয়েই না রইল, যদি কারও ভোগেই না লাগল, তবে সে রূপ থাকা না থাকা দুই-ই সমান। অন্তত নিশির তাই ধারণা।

পারতপক্ষে নিজের দিকে তাকায় না নিশি। কখনও যদি বা তাকায় চোখ আর ফেরাতে পারে না। কেমন যেন ঘোর লেগে যায়। ফিসফিস করে নিজেকেই তখন শোনাতে থাকে সে, 'হেই মা গোসানী, এত রূপ! রূপ না তো, এ হল কাল। আমার

[illegible] বলতে চোখ বুজে ফেলে নিশি। বুকটা ছুরু ছুরু করে। অদ্ভুত এক ভয় তাকে পেয়ে বসে।

নিশির বয়স একুশ। একুশ বছর বয়সটা রূপের পক্ষে সুসময়। তার সারা দেহে এখন ভরা কোটাল।

রূপের বয়সে রূপ থাকবে, এতে দুশ্চিন্তার কী আছে? কিছু নেই, আবার আছেও।

নিশি জানে, যত রূপ তত ভয়। যত ভয় তত অবিশ্বাস।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে—সব সময় ভয়। কে কানাকানি করল, কোথায় ফিসফিস শব্দ হল, বুক অমনি কেঁপে উঠল। যতদিন রূপ ততদিন এই কাঁপুনি।

রূপ বড় বিদম জিনিস।

রূপের বয়সে মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ কি করতে কি করে বসে, সে নিজেই জানে না। রূপকে একেবারেই বিশ্বাস নেই।

রূপ কি সোনাদানা, যে বাক্সে পুরে কুলুপ এঁটে রাখবে। যদি রাখতে পারত নিশি বেঁচে যেত। দিনরাত ঘরে খিল এঁটে তো বসে থাকা যায় না। নানা দরকারে মানুষের সামনে বেরুতেই হয়।

মানুষ! মানুষ কোথায়! এক একটা চিল, শকুন, কামট। সর্বক্ষণ তারা চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ। একেবারে লুট করে নিয়ে যাবে।

নিজের দিকে তাকিয়ে নিশির বড় ভয়, বড় ভাবনা।

তাই বুঝি রূপসী যুবতী মেয়ের একজন সঙ্গী দরকার। বিশ্বাসী পুরুষ সঙ্গী। দুহাত বাড়িয়ে যে তাকে আগলে আগলে রাখবে। তার কাছে নিজের সব দায় সব দায়িত্ব সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্তে থাকবে। জগতের আর সব নিয়মের মত এও একটা নিয়ম।

এতকাল যোগেন বেঁচে ছিল। নিজের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ছিল না নিশির। তার সব ভাবনা যোগেনই ভেবেছে।

কিন্তু আজকাল?

আজকাল নিজের ভাবনা নিজেকেই ভাবতে হচ্ছে।

মানুষকে বাঁচতে হলে, সুখ হোক দুঃখ হোক, [illegible],
যাই হোক, একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে হয়। কিন্তু নিশির
জীবনে তেমন কিছুই নেই। না সুখ, না দুঃখ, না আশা, না নিরাশা।

নিশির আছে শুধু চিন্তা। নিজেকে নিয়ে অন্তহীন দুর্ভাবনা।
যোগেন মরার পর এই দুর্ভাবনাকে সম্বল করে সে বেঁচে আছে।

ইচ্ছা করলেই কিন্তু নিশির চিন্তা ঘুচতে পারে নয়া বসতে
জোয়ান ছেলের অভাব নেই। তাদের কারুকে বেছে নিয়ে নিজের
সব ভাবনা তার হাতে তুলে দিতে পারে।

জীবনের তাগিদেই এখন আর একটি পুরুষ সঙ্গী দবকাব।

সোয়ামী মরবার পর যদি বয়স থাকে, যদি স্বাস্থ্য কুলোয়,
সবাই বিয়ে করে। তাদের সমাজে এটা দোষের না ববঞ্চ একটা
নিয়মের মত।

বছরখানেক হল যোগেন মরেছে। নিশি কিন্তু এখনও বিয়ে
করল না। সংসারে সে-একা, একেবারে একা।

নিশির মনে কি আছে, কে জানে।

দশ

নয়া বসতেব শেষ মাথায় নিশিব ঘর। ঘরটা উঁচু একটা ঢিবিব
ওপর।

ঢিবির ঠিক পেছনেই খাড়ি। খাড়ির মুখে নোনা জল অবিবাম
গর্জায়, দিনরাত শাসায়।

দু-বছর হল নিশিরা সমুদ্রের মুখে এসে বসত কবেছে। প্রথম
প্রথম নোনা জলের গজরানি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে
যেত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

বঙ্গোপসাগর থেকে বাতাস উঠে এসে প্রথমেই নিশির ঘরটাকে
হাতের কাছে পায়। ঘরটার ঝুঁটি ধরে ইচ্ছামত ঝাকুনি দিয়ে নয়া

বসন্তে [illegible] ঘরের চালেই দিনের প্রথম রোদ সবার আগে এসে পড়ে।

চারপাশে মাটির দেওয়াল, ওপরে নক্সাকরা গোলপাতার চাল। চালটার দু-পাশে দুটো কাঠের ময়ুর বসানো।

নিজের হাতে চালটা ছেয়েছিল যোগেন। নক্সা ফুটিয়েছিল। ময়ুর বসিয়েছিল।

যোগেন মানুষটা ছিল ভারি সৌখিন। চালটার দিকে তাকালেই তার কথা মনে পড়ে যায়। ভুলেও কিন্তু সেদিকে তাকায় না নিশি। তাকিয়ে লাভই বা কী?

নিশির স্বভাব বড় বিচিত্র। যে যোগেন বেঁচে নেই, কোনদিনই যাকে আর পাওয়া যাবে না, তার কথা ভেবে অকারণে সে কষ্ট পেতে চায় না।

এখন সকাল।

সমস্ত পুব দিকটা জুড়ে ঘন কুয়াশার একটা পর্দা ঝুলছে। চারপাশ ঝাপসা। সূর্যটা চোখ মেলতে পারছে না। হেমন্তের কুয়াশা তাকে অন্ধ করে রেখেছে।

ঘরের সামনের দিকে একটু দাওয়া মত। দাওয়ার পর থেকে উঠোন। ঘুম থেকে উঠে নিশি দাওয়ায় এসে বসল।

এই সকাল বেলা কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছে। ডাকটাই শুধু শোনা যাচ্ছে। কুয়াশার জন্যে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

পাখির ডাক, কুয়াশা—কোনদিকে হুঁশ নেই নিশির।

উঠোনের এক কোণে একটা শিমূল গাছ। উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে, আর বিভোর হয়ে কি যেন ভাবছে।

শুধু আজই নয়, রোজ সকালে উঠেই নিশি ভাবতে বসে। এটা যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

জগতে সে একা। একেবারে একা। যত একাই হোক, তবু তো সংসারী মানুষ। আর সংসারী মানুষের কি একটা ঝামেলা!

ধাবাবাড়া, ধোয়ামোছা, ঘষামাজা [illegible]
ঝামেলা !

শুধু সংসার নিয়ে মেতে থাকতে পারলেই পৃথিবীর আর দশটা মেয়েমানুষের দিন কেটে যায়। কিন্তু নিশির জীবন তত মসৃন নয়। সংসার ছাড়াও তার অন্য কাজ আছে। নিজের খাওয়া-পরার জন্য তাকে রোজগার করতে হয়।

কাজ আর কাজ। একদিকে সংসারের কাজ, আরেক দিকে রোজগারের। এত তো কাজ, কিন্তু এই সকালবেলাটা কিছুই করে না নিশি। এ সময়টা জগৎ-সংসারের কোন কথাই তার মনে থাকে না। শুধু দুর্জ্ঞেয় এক ভাবনাকে নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকে সে।

রোজ রোজ নিশি কী এত ভাবে ?

নিশি যে কী ভাবে, এই সকালবেলায় তার মনে যে কিসের লীলা চলে, কে তার হদিস দেবে ! সে যুবতী, সোয়ামী মরার পর এই একবছর সঙ্গীহীন নিরুৎসব জীবন কাটাচ্ছে, রোজ ঘুম থেকে উঠে সে যে কী ভাবতে বসে, শুধু সেই জানে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষ তার নাগাল পায় না।

আজ কিন্তু নিশির ভাবনা বেশিদূর এগুলো না। এই সকাল-বেলাতেই গুপী এল।

একটু আগেও নিশির চোখদুটো ছিল উদাস। গুপীকে দেখে সেই চোখ চিকচিক করে উঠল। দুই ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটল।

নিশি বলল, 'আজ আমার কি ভাগ্যি গো—' গলাটা কেমন যেন তরল শোনাল তার।

'ভাগ্যি কি রকম !'

'সক্কালবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই তুমার মুখ দেখলম। এ ভাগ্যি লয় ।'

গুপী জবাব দিল না।

চুপচাপ খানিকটা সময় কেটে গেল।

[illegible] কখন, এই সক্কালবেলা তুমায় কাছে অন্তত দরকারে আসতে হল।'

'আমি জানতম, তুমি আসবে।'

'তুমি জানতে!' অবাক চোখে নিশির দিকে তাকাল গুপী।

নিশি বলল, 'হ্যাঁ।'

নিশির কথা বিশ্বাস করতে মন ঠিক সায় দিচ্ছে না। তাই গুপী শুধলো, 'সত্যি কইচ?'

'সত্যি গো, সত্যি। ভগমানের দিব্যি। এই সক্কালবেলা তুমি যে আসবে, শুদু তাই লয়, কি জন্যে আসবে, তাও জানতম।'

'বল দিকিন, কি জন্যে এইচি?'

'এট্টা খপর দিতে।'

'সেই খপরটাও জান নাকিন?'

নিশি মাথা নাড়ল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, 'জানি।'

'কী খপর বল দিকিন—'

নিশি হাসল। বলল, 'জানি কি-না, যাচাই করচ?'

'ধর তাই।'

'তা হলে শুন'—নিশি শুরু করল, 'কাল রাত্তিরে এট্টা বুড়ীকে তুমাদের সংসারে ঠাই দিয়েচ। নাম তার ভাঁটুনি। তুমরা দু ভাই তার সব দায় লিয়েচ। এবার থেকে সে তুমাদের কাছেই রইবে।'

একটু থামল নিশি। গুপীর দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'সক্কালবেলা এই খপরটাই তো দিতে এয়েচ, তাই লয়?—'

দু-চোখে বিস্ময় ফুটল গুপীর। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?' নিশি প্রশ্ন করল।

'এট্টা কথা আমি বুঝতে পারচি নি।'

'কী কথা?'

'আমি যে এখন আসব, ভাঁটুনী বুড়ীর খপর দোব—এ সব তুমি জানলে কী করে?'

নিশি এতক্ষণ দাওয়ায় বসেছিল। আর [illegible] দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল গুপী।

এবার নিশি উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে গুপীর কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'কী করে জানলম, শুনতে চাইচ?'

'হ্যাঁ।'

গুপীর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিশি বলল, 'হাত গুনে জানলম!'

'হাত গুনে!' গুপীর গলায় বিস্ময় ফুটল।

'হ্যাঁ গো ব্যাটাছেলে। আজকাল আমি হাত গুনতে শিকিচি। আমার কাচে কখন তুমি আসবে, কি কইবে, আগে ঠেঙে সব জানতে পারি।'

নিশির চোখ দুটো আশ্চর্য কালো। সেই কালো চোখ কৌতুকে ঝিকমিক করছে। এতক্ষণ দুই ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত একটু হাসিকে আটকে রেখেছিল সে। কেমন করে যেন হাসিটা ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়েই মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে।

কি একটা বলার জন্য মুখ তুলেছিল গুপী। হঠাৎ নিশির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

নিজের চোখদুটো আর সরাতে পারল না গুপী। একদৃষ্টে তাকিয়েই রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ঘোর লেগে গেল তার।

এক সময় ফিস ফিস করে উঠল নিশি, 'অমন করে কী দেখচ ব্যাটাছেলে!'

গুপী থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখদুটো সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিচু লয়।'

গুপীর বুকের কাছে আরো নিবিড় হয়ে এল নিশি উন্মুখ হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অস্থির গলায় শুধলো, 'সত্যি কইচ, কিচু লয়!'

গুপী কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু পারল না।

নিশি এত ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার নিশ্বাস গায়ে এসে

লাগছে। নিশ্বাসটা বড় গাঢ়, বড় গরম। তার চুল থেকে, ঘাড় থেকে, গাল-গলা আর বুক থেকে, তার সুঠাম শরীরের প্রতিটি অংশ থেকে একটা বিচিত্র গন্ধ উঠে আসছে।

গুপীর স্নায়ুগুলো ঝিমঝিম করতে লাগল। অসহ্য আবেগে বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল।

নিজের মনকে গুপী বোঝাল, 'এ ভাল লয়। নিশি আমার মিতের বউ। তার জন্যে বুকের এই কাঁপ ভাল লয়।'

বোঝাল বটে, কিন্তু বুকের কাঁপুনিটা ভারি অবুঝ। কিছুতেই তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। কিছুতেই সে বশ মানছে না।

এদিকে বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। কুয়াশা কেটে গিয়েছে। রোদের ঢল নেমেছে নয়া বসতে।

এখন আকাশের দিকে তাকালে চোখ আর ফেরানো যায় না। যতদূর তাকানো যায়, আকাশটা অবাধ, উদার। তার নীল রঙটুকু ভারি কোমল ভারি স্নিগ্ধ।

অনেক উঁচুতে, আকাশের নীলের কাছে, কয়েকটুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘগুলো বড় অলস, বড় মন্থর। দেখলেই বোঝা যায়, কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই তাদের। কিন্তু বিপদ বাধিয়েছে উত্তুরে বাতাসটা। বাতাসটা বড্ড জেদী আর একগুঁয়ে। অনিচ্ছুক মেঘগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে নিয়ে চলেছে সে।

রোদ-আকাশ-মেঘ—কোন দিকে খেয়াল নেই। বুকের সেই কাঁপুনিটার সঙ্গে মরিয়া হয়ে ধুঁকতে লাগল গুপী। অনেকক্ষণ পর বুকটা স্থির হল।

আস্তে আস্তে গুপী ডাকল, 'শুনচ—হেই গো—'

'বল।' পাশ থেকে নিশি সাড়া দিল।

'সত্যি কথাটা কিন্তু তুমি কইলে না।'

'কী কথা?'

'ওই কেমন করে জানলে, আমি এখন আসব, বুড়ীর খপর দোব।'

'কইলম তো হাত গুনে জেনেচি।'—খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নিশি।

গুপী বলল, 'তুমি ভেবেচ কী! তুমার ওই হাত গোনার কথা আমি বিশ্বেস করুব! কক্ষনো লয়।'

'বিশ্বেস করা না করা তুমার ইচ্ছে।'

'না-না মেইয়ে ছেলে, উ-সব ধানাই পানাই শুনতে চাই না। সত্যি কথাটা বল'—গুপী এবার পীড়াপীড়ি শুরু করল।

স্থির চোখে কিছুক্ষণ গুপীর দিকে তাকিয়ে রইল নিশি। বলল, 'তুমিই বল নয়, কেমন করে জানলম!'

'আমি কী করে কইব!'

'এট্টু ভেবে ত্যাখ।'

'অনেক ভেবিচি। কিন্তু বুঝতে পারচি না।'

'পারচ না?'

'না।'

কি একটু ভাবল নিশি। তারপর বলল, 'আরে বাপু, তুমার সব খোঁজ রাখি যে! কুথায় তুমি কি কর, কি বল, সব আমার চোখে পড়ে, সব কানে আসে।' একটু থেমে আবার, 'কাল রাত্তিরে ভাঁটুনী বুড়ীর দায় য্যাখন তুমার ঘাড়ে চাপল ত্যাখনই বুঝলম, আজ তুমি আসবে।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল গুপী। তারপর আবছা গলায় শুধলো, 'তুমি আমার সব খোঁজ রাখ?'

'না রাখলে চলে!' নিশি হাসল। বলল, 'চারপাশে কত কামট হাঁ করে আচে। সুযুগ পেলেই তুমায় টপ করে গিলে ফেলবে। তাই সব সোময় চোখে চোখে রাখি।'

এ-ব্যাপারে গুপী আর কিছু বলল না। প্রাণপণ যুঝে যে কাঁপুনিটাকে একটু আগে সে থামিয়েছিল, আবার সেটা শুরু হয়েছে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে এক সময় গুপী বলে উঠল, 'এ্যাতক্ষণ এইচি, আসল কথাটা কিন্তুক এখনো কওয়া হয় নি।'

'কী কথা?' সোজাসুজি গুপীর চোখের দিকে তাকাল নিশি।

মুখ কাচুমাচু করে গুপী বলল, 'ত্যাখ মেইয়েছেলে, তুমার কাচে এট্টা দোষ হয়ে গেচে!'

'কিসের দোষ!'

'কাল রাত্তিরে মুরুব্বি ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে; ঝোঁকের মাথায় আমিও বুড়ীটাকে নিয়ে নিলম। নেওয়ার আগে তুমার সনগে যে এট্টা পরামোশ্য করব, ত্যামন সোময়ই পেলম নি।'

'এতে দোষের কী হল!'

'দোষ লয়!'

'না গো না।' নিশি বলল, 'তুমার সোমসারে যাকে খুশি ঠাই দেবে। তার জন্যে আমার সনগে পরামশ্য কেন? আমার কাচে তুমার কোন দায়?'

অস্থির গলায় গুপী বলে উঠল, 'পেরাণের দায়' বলেই নিশির মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

গুপীর মুখের কাছে নিজের মুখটাকে নিয়ে এল নিশি। খুব মৃদু গলায় বলল, 'সত্যি কইচ!'

গুপী জবাব দিল না।

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ গুপী বলে উঠল, 'সোময় করে আজ একবার আমার ওখেনে যেও। বুড়ীটাকে দেখে এস। যেও কিন্তু'

কোনরকমে কথা ক'টা বলে আর দাঁড়াল না গুপী হন হন করে চলে গেল।

গুপী চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। উঠোনের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নিশি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুপীর সেই অদ্ভুত কথাটা ভাবছে। তার কাছে নাকি গুপীর প্রাণের দায় আছে।

যোগেন মরার পর এই একবছর নিশির কাছে যাতায়াত করছে গুপী। একরকম ঘনিষ্ঠতাই হয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু এর আগে কোনদিনই গুপীর মুখে এমন কথা শোনে নি নিশি।

'পেরাণের দায় !' নিশি ফিস ফিস করতে লাগল। নিজের কানেই নিজের গলাটা কেমন যেন গাঢ় শোনাল, 'আমার কাচে ওর পেরাণের দায় ! তা হবে, তা হবে।'

নিজের মনে হেসে উঠল নিশি। তীক্ষ্ণ, রিনরিনে একটু শব্দ হল। তীব্র একটা মোচড় খেয়ে ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল তার।

এগার

নয়া বসতের এক মাথায় নিশির ঘর, আরেক মাথায় কুবের মুরুব্বির।

এক দিক থেকে কুবের আর নিশির মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল আছে। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে নিশি তার ভাবনা নিয়ে বসে আর কুবের বসে তার নেশা নিয়ে।

এই সকালবেলাটা দুজনেই বুঁদ হয়ে থাকে। একজন নেশার ঘোরে, আরেকজন অন্তহীন ভাবনার মধ্যে।

আজ সকালে গুপী যখন নিশির কাছে গিয়েছে, ঠিক সেই সময় নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে আছে কুবের। তার সামনে হুঁকো-কলকে, তামাক-আগুন নেশার যাবতীয় সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে।

মাত্র তিনজন নিয়ে কুবেরের সংসার। কুবের নিজে, মেয়ে ভামিনী আর সারী। সারী কুবেরের বউ।

ভামিনী কি সারী—এখন কেউ বাড়ি নেই। বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কোথায় যেন বেরিয়েছে ভামিনী। আর সারী গিয়েছে খাড়িতে চান করতে।

অনেকক্ষণ হল তারা বেরিয়েছে। এখনও ফিরছে না।

যখন খুশী সারীরা ফিরবে। তার জন্য কুবেরের দুর্ভাবনা নেই। পরিপাটি করে এক ছিলুম তামাক সাজল সে। তারপর আয়েশ করে টানতে লাগল।

তামাকটা বেশ কড়া। টানতে টানতে মেতাত জমে গেল।
আরামে কুবেরের চোখ বুজে এল।

জগতে নিরঙ্কুশ সুখ বলে বোধ হয় কিছু নেই। তামাকের নেশাটা সবেমাত্র জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় তাল্ কেটে গেল।

খাড়ি থেকে চান সেরে এইমাত্র ফিরে এল সারী। সারা গায়ে ভিজে কাপড় লেপটে আছে। ভাল করে মাথা মোছা হয় নি। চুল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে।

কুবেরকে দেখে সারী যেন ক্ষেপে উঠল। উত্তেজিত, তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'তুমার ইচ্ছেটা কি?'

গলার ঝাঁঝেই বোঝা গেল, কিছু একটা হয়েছে। ভয়ে কুবেরের বুক কেঁপে উঠল।

সারী মানুষটা এমনিতে মন্দ না। বেশ সরল আর শান্ত। মনে লেশমাত্র কুটিলতা নেই। কারো কথায় সে থাকে না। দরকার ছাড়া কোথাও যায় না। নিজের ছোট্ট সংসারটি নিয়ে সবসময় সে মেতে থাকে।

গুণ তার অনেক। কিন্তু সংসারে কোন মানুষই বুঝি নিখুঁত না। সারীও না। অনেক গুণের মধ্যে তার একটা দোষও আছে। এই দোষটা হল রাগ।

মানুষ মাত্রেরই রাগ আছে। কিন্তু সারীর রাগ একেবারে সৃষ্টিছাড়া। কোন কারণে একবার যদি রেগে যায়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কেঁদে চেঁচিয়ে চুল ছিঁড়ে কপাল ঠুকে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে। সারাদিন খায় না। কারুকে খেতেও দেয় না। হাতের কাছে যা পায়, ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ করে ফেলে।

সারীর বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। এতখানি বয়েস হল, কিন্তু দোষটা এখনও শোধরাল না। এ জন্মে আর শোধরাবেও না। যতদিন বেঁচে থাকবে, এই রাগ তার যাবে না।

হবে ওপরেই বাগুক, কারণ যা-ই থাক, চোটটা কিন্তু শেষ

পর্যন্ত কুবেরের ওপর দিয়েই যায়। আর যার ঝলেই সারাকে রাগতে দেখলে কুবের তটস্থ হয়ে ওঠে।

এই সকালবেলা সারী কেন যে ক্ষেপেছে, কুবের জানে না। যতক্ষণ পুরোপুরি ব্যাপারটা সে না জানছে, মুখে কুলুপ এঁটে রাখবে। এখন মুখ খোলা কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কি বলতে সে কি বলে বসবে শেষে কি একটা অনর্থ ঘটবে!

চোখ বুজে জোরে জোরে হুঁকো টানছে কুবের।

সারী কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'চুপ করে রইলে যে! কথা কানে যাচ্ছে নি!'

আস্তে আস্তে হুঁকোটা নামিয়ে রাখল কুবের। গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী কইচিস!'

'কী আবার কইব!'

সারী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'শুদুচ্চি তোমার ইচ্ছেটা কী?'

'কিসের ইচ্ছে?'

'ভামির বে দেবে না দেবে নি?'

স্থির চোখে কুবেরের দিকে তাকাল সারী।

'দোব নি, এ্যামন কথা কখনো কোয়েচি!' শান্ত গলায় কুবের বলতে লাগল, 'মেইয়ে হয়ে য্যাখন জন্মেচে, বে তার দিতেই হবে।'

'তুমার রকম-সকম দেখে তো মনে হচ্ছে না।'

'তাই লাকিন?' কুবের হেসে উঠল।

'অমন হেসো নি তো।' সারী ফুঁসে উঠল, 'ঘরে অত বড় আইবুড়ো মেইয়ে। আর তুমি হাসচ!'

'হাসলে দোষ?'

'একশো বার দোষ।' সারী গজগজ করতে লাগল, 'মেইয়ের বাপ হয়ে বসেচ' এতটুকুন ভাবনা লেই। চিন্তা লেই। বে দেবার চাড় লেই। এ্যামন বাপ জম্মে দেখি নি।'

হুঁকোটা আবার তুলে নিয়েছিল কুবের। একটা টান দিয়ে বুঝতে পারল, তামাক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছাই ঝেড়ে নতুন

করে কলকে সাজাতে লাগল সে। বলতে লাগল, 'এই সকালবেলা মেইয়ের বে বে করে অমন ক্ষেপে উটলি কেন?'

'না, ক্ষেপবে নি।' সারী বলল, 'মেইয়ে অত বড় হয়ে উটেচে। ধেই ধেই করে এখেনে-ওখেনে লেচে বেড়াচ্চে। পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইচে। সে হুঁশ তুমার আচে?'

সারীর মুখের দিকে তাকাল কুবের। তার মনে হল, সারী রেগেছে ঠিকই। কিন্তু রাগটা অন্য দিনের মত মাত্রাছাড়া নয়। এতে খানিকটা সাহস পেল সে। শুধলো, 'কে আবার কী কইচে?'

'এই তো খাড়িতে চান করতে গিছলম। সেকেনে লারাণের মা আর পাঁচুর বৌর সনগে দেখা।'

'দেখা তো হয়েচে কী?'

'হবে আবার কী?' সারী বলল, 'গায়ে পড়ে তারা কতগুলোন কথা শুনিয়ে দিলে।'

'কী শোনালে?'

'আমরা লাকিন মেইয়ের বে দোব নি। বে দেবার গরজই লাকিন আমাদের লেই।'

এই সকালবেলা সারী কেন যে ক্ষেপেছে, এতক্ষণে বোঝা গেল।

তামাক সাজতে সাজতে কুবের বলল, 'লারাণের মা পাঁচুর বৌ তা হলে এ সব কইল!'

'না কইলে আমি তাদের নামে বানিয়ে কইচি!'

সারী বলতে লাগল, 'এাখন তো তবু দু-চারজন কইচে। এর পর কান পাততে পারবে নি।'

খানিকটা চুপচাপ।

এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কুবের। হঠাৎ তার খেয়াল হল, বেশ কিছুক্ষণ আগে খাড়ি থেকে চান করে এসেছে সারী। আর সেই থেকে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খেয়াল হতেই কুবের তাড়া দিয়ে উঠল, 'যা-যা, তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় পাল্টে ফ্যাল গে—'

সারী আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঢুকল।

বেলা আরো বেড়েছে। রোদ তেতে উঠেছে।

একবার আকাশের দিকে তাকাল কুবের। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে আনতে হল। আকাশটা আশ্চর্য নীল। রোদ লেগে সেই নীলের জেল্লা এমন খুলেছে যে চোখ রাখা যায় না।

কুবেরের ঘরের সঙ্গেই দাওয়া। দাওয়ার পর থেকেই উঠোন। উঠোনের এক কোণে একটা পেয়ারা গাছ। দুটো সুরুলে পাখি তার ডালে বসে আছে।

পাখিদুটোর কোনদিকে হুঁশ নেই। নিজেদের নিয়েই তারা মেতে আছে। কখনো ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছে। কখনো খুনসুটি করছে। পরস্পরকে ঠুকরে ঠুকরে কখনো বা সোহাগ জানাচ্ছে।

পাখিদুটো যা খুশি করুক। তা নিয়ে কুবেরের মাথাব্যথা নেই। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে সারীর কথাগুলো ভাবছে সে। ঠিক কথাই বলেছে সারী। ভামিনী বড় হয়ে উঠেছে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দেওয়া দরকার।

কুবেরের ভাবনা বেশিদূর এগুলো না।

ঘর থেকে সারী বেরিয়ে এল। এর মধ্যে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে একটা শুকনো কাপড় পরে নিয়েছে সে।

সারী ডাকল, 'শুনচ—'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল কুবের, 'বল্'—

'ভামির জন্যে এট্টা ছেইলে দ্যাখো।'

'লোতুন করে ছেইলে আবার কি দেখব।' কুবের বলল, 'ছেইলে তো একরকম ঠিক করাই আচে।'

'কে?'

'কে আবার, গুপী।'

কি একটু ভাবল সারী। তারপর বলল, 'ছেইলে য্যাখন ঠিক করা আচে ত্যাখন হাত-পা গুটিয়ে বসে আচ কেন? বে'র ব্যেবস্থা করে ফেল।'

'করব-করব, অত তাড়া কিসের। যাক না আর ক'টা দিন।'

না-না, আর এট্টা দিনও লয়।' সারী অস্থির হয়ে উঠল, 'আজকেই তুমি গুপীর ওখানে যাবে। বে'র কথা পাকা করে আসবে।'

কুবের বলল, 'কিন্তুক—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে কুবেরের দিকে তাকাল সারী।

'এট্টা কথা ভেবে দেখিচিস?'

'কী কথা?'

কুবের বলল, 'বে দিলেই তো মেইয়েটা পরের কাচে চলে যাবে।'

সারী বলল, 'বে হলে সব মেইয়েই পরের কাচে যায়। ভামিও যাবে। এ আর লোতুন কথা কী?'

'না-না সে কথা কইচি না।'

'তবে কী কইচ?'

'দশটা লয় পাচটা লয়, ভামি আমাদের এট্টা মাত্তর মেইয়ে। ও চলে গেলে ঘর-সোমসার আঁধার হয়ে যাবে। ত্যাখন থাকব কেমন করে?'

কুবেরের মনের কথাটা সারী বোঝে। ভামিনী পরের ঘরে গেলে তাদের খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু কষ্ট বলে তো চিরকাল মেয়েকে নিজেদের কাছে রাখা যাবে না। পরের ঘরে পাঠাতেই হবে।

আস্তে আস্তে সারী বলতে লাগল, 'কি করবে, বল। মেইয়ে বড় হলে বে দিতে হয়। এ হলো সোমসারের নিয়ম।'

অস্ফুট গলায় কুবের কি বলল, বোঝা গেল না।

সারী আবার বলল, 'আজই গুপীর কাছে যাও। বুঝলে?'

'দেখি।'

'দেখি লয়, লিচ্চয় যাবে।'

কুবের জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল, ঠিক আজই না হোক, কাল-পরশু যখন হয়, সুবিধেমত একবার গুপীর কাছে যাবে। তার সঙ্গে বিয়েব কথাবার্তা পাকা করে আসবে।

বার

দিন ছয়েক হল গুপীদের সংসারে এসেছে ভাটুনা।

কতটুকুই বা সংসার। তাকে ধরলে মোট তিনটে মানুষ গুপী, গুপীর ভাই মধু আর সে নিজে।

যত ছোটই হোক, তবু তো সংসার। সেখানে সে আশ্রয় পেয়েছে। গুপীরা শুধু আশ্রয়ই দেয় নি। সুখ দুঃখের ভাগ দিয়ে তাকে নিজেদের একজন করে নিয়েছে।

এতকাল লোকের দরজায় দরজায় মাথা কুটে মরেছে ভাঁটুনী। তার বুকে ছোট্ট একটা সাধ ছিল। কোথাও, কোন সংসারে সে একটু ঠাঁই পাবে। জগতেব আব দশজনেব মত তাব জীবন সুস্থ হবে, স্বাভাবিক হবে।

কিন্তু না, এতদিন এই সামান্য সাধটাও তার মেটে নি।

মাথা কুটে কুটে রক্তারক্তি করে ফেলেছে ভাঁটুনী। তবু একটা দরজাও খোলে নি।. হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেয় নি। যেখানেই সে গিয়েছে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এতকাল নিজের জীবন সম্বন্ধে কোন মোহই ছিল না ভাঁটুনীর। যে জীবন কুকুরেব মত এর দুয়ারে তাব দুয়ারে তাড়া খেয়ে ফেরে, তার প্রতি মোহ থাকাব কথা নয়। ববঞ্চ বিমুখ বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

আশ্চয!

গুপীর সংসারে এসে এতদিনের তাড়া-খাওয়া, ছন্নছাড়া জীবন টাকে এই প্রথম ভালবেসে ফেলেছে ভাঁটুনী।

মানুষ দু-ভাবে বাঁচে। কেউ আনন্দে বাঁচে। কেউ মরতে পারে না বলে বাঁচে। এতদিন মরতে পারে নি, তাই ভাঁটুনী বেঁচে আছে। তার বেঁচে থাকার পেছনে গ্লানি ছাড়া অন্য কিছু নেই।

গুপীদের কাছে এসে বেঁচে থাকার আরেকটা মানে খুঁজে পেয়েছে ভাঁটুনী। এই প্রথম সে বুঝতে শিখেছে, বাঁচার মধ্যে শুধু গ্লানিই নেই, মর্যাদাও আছে।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে ভাঁটুনী বুড়ী। এক কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

সেই বিকেল থেকে কুয়াশা পড়ছে। গাঢ় হিম-হিম কুয়াশা। চারপাশ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

কয়েক টুকরো তামাটে মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে পাড়ি জমিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এলোপাথাড়ি বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

বসে বসে নিজের কথাটাই ভাবছিল ভাঁটুনী। ক'দিন আগেও তার জীবনের চেহারাটা কেমন ছিল?

সমস্ত দিন সে ভিক্ষে করে বেড়াত। রাত্রিবেলা এর দাওয়ায় তার দাওয়ায়, হাটের চালায়, গাছতলায়, যখন যেখানে সুবিধে হত, পড়ে থাকত।

ভিক্ষের মত একটা অনিশ্চিত, গ্লানিকর জীবিকাকে ভরসা করে পৃথিবীতে এতগুলি বছর সে টিকে আছে। ভাবতে কেমন যেন লাগে।

এতকাল কি খাবে, কোথায় থাকবে, এ-ই ছিল তার চিন্তা। এই চিন্তায় দিনরাত অস্থির হয়ে থাকত ভাঁটুনী।

মাত্র ক'দিন হল, সেই চিন্তাটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে। গুপীদের সংসারে পাকাপোক্ত একটা আশ্রয় পেয়ে নিজের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

ভাঁটুনী বুড়ীর ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। হাট থেকে গুপী আর মধু ফিরে এল।

গুপী, মধু—দু-ভায়েরই মাছের কারবার। চাঙাড়ি ভরতি মাছ নিয়ে ভোরবেলা তারা আবাদের হাটে চলে গিয়েছিল।

সব মাছ বিক্রী হয়ে গিয়েছে। খালি চাঙাড়িগুলো উঠোনের একপাশে নামিয়ে রেখে দু-ভাই দাওয়ায় এসে উঠল। বলল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি ভাত বাড় পিসী।'

গুপীরা ভাঁটুনীকে পিসী বলে ডাকতে শুরু করেছে।

ভাঁটুনী বলল, 'রাজ্যি মাড়িয়ে এলি। যা আগে পা ধুয়ে আয়।'

গামছা নিয়ে দু ভাই খাড়ির দিকে চলে গেল।

রাত্রিবেলা ভাল ঠাহর পায় না ভাঁটুনী। হাতড়াতে হয়। হাতড়ে হাতড়ে হাঁড়ি বার করল সে। দুটো থালায় ভাত বাড়ল। বেড়ে বসে রইল।

একটু পর খাড়ির জলে হাত-পা ধুয়ে দু ভাই ফিরে এল। ফিরেই খেতে বসল।

ভাত, ডাল, পার্শে মাছ ভাজা, চাঁদা মাছের ঝাল—পরিপাটি করে রেঁধেছে ভাঁটনী।

খেতে খেতে গুপী বলল, 'এমন খাওয়া অনেক দিন খাই নি।'

মধু বলল, 'চাঁদা মাছের ঝালটা যা হয়েচে—' বলেই পেল্লায় একটা গরাস মুখে পুরল।

ভাঁটুনী কিছু বলল না।

দু ভাই চেটেপুটে হুসহাস করে খাচ্ছে। রাতকানা ঘোলাটে চোখে তাদের দিকে চেয়ে আছে ভাঁটুনী। অদ্ভুত এক খুশিতে তার মনটা ভরে গিয়েছে।

নিজের হাতে রেঁধে মানুষকে খাওয়াতে যে এত সুখ এত তৃপ্তি, এর আগে কোনদিন জানে নি ভাঁটুনী।

গুপী বলল, 'এমন করে রেঁধে বেড়ে কাচে বসিয়ে কেউ আমাদের খাওয়ায় নি। কেউ না।'

ভাঁটুনী বলল, 'কেউ না খাওয়াক, তোদের মা তো খাইয়েচে।'

ভাত মাখতে মাখতে গুপী মুখ তুলল। বলল, 'না'।

'কি কইচিস গুপী!' ভাঁটুনীর চোখেমুখে বিস্ময় ফুটল।

'ঠিকই কইচি।'

অল্প একটু হাসল গুপী। হাসিটা করুণ, বিষণ্ণ।

খুব সম্ভব, গুপীর কথা বিশ্বাস করে নি ভাঁটুনী। নিজের মনে কি একটু ভেবে নিল সে। আস্তে আস্তে শুধলো, 'সত্যি, মা'র হাতে তোরা কোনদিন খাস নি?'

মাত্র দু দিন হল গুপীদের কাছে এসেছে ভাঁটুনী। তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সে জানে না। যদি জানত, এমন কথা শুধতো না।

'সত্যিই গো পিসী।'

গুপী বলতে লাগল, 'মা'র হাতে খেতে হলে কপালের দরকার। ত্যামন কপাল আমাদেব লয়!'

ভাঁটুনী বলল, 'অমন কথা কইচিস কেন?'

'সাদে কি আর কইচি পিসী, অনেক দুঃখে কইচি।'

গুপীর বুকের অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। ধরা গলায় সে বলল, 'মাকে পেলম কুথায় যে তাঁর হাতে খাব। আমার বয়েস য্যাখন দু বছর আর মধুর ছ মাস, ত্যাখন মা মরেচে। মা'র কথা আমাদের মনেই পড়ে না।'

বিড় বিড় করে ভাঁটুনী কি বলল, বোঝা গেল না।

গুপী থামে নি, 'লোকে বলে, মা মা। মা যে কি জিনিস, এ জন্মে জানলম নি। মা থাকার যে কি সুখ, কোনদিন বুঝলম নি।'

অস্ফুট গলায় ভাঁটুনী বলল, 'আহা রে—'

এরপর একেবারে চুপচাপ।

গুপী, মধু কি ভাঁটুনী—কেউ আর কিছু বলছে না। গভীর এক দুঃখ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

অনেকটা সময় কেটে গেল।

কুয়াশা আরো ঘন হয়েছে। একটু আগেও সমুদ্র থেকে বাতাস উঠে আসছিল। কয়েক টুকরো ছন্নছাড়া মেঘকে নিয়ে মাতামাতি করছিল। হঠাৎ বাতাসটা পড়ে গিয়েছে। চারপাশের আবহাওয়া কেমন যেন গুমোট আর ভারী হয়ে উঠেছে।

উঠোনের এককোণে একটা ঢ্যাঙা চেহারার মাদার গাছ।

হেমন্তের শুরুতেই তাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে সব পাতা ঝরে গিয়েছিল। সরু সরু কদাকার ডালগুলো আকাশের দিকে মেলে ধরে গাছটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে! অন্ধকারে তাকে কঙ্কালের মত দেখায়।

মাদার গাছটার মাথায় একটা রাতভীরু মদন পাখি থেকে থেকে কেঁদে উঠছে।

একসময় ভাঁটুনী বুড়ী ডাকল, 'গুপী—হেই রে—'

গুপী খাচ্ছিল না। হাত গুটিয়ে মুখ বুজে বসে ছিল। বলল, 'কী?'

কি একটু ভাবল ভাঁটুনী। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'তোদের কথা বল, শুনি—'

'আমাদের কথা শুনতে চাইচ?'

'হ্যা—'

'কী কথা?'

ভাঁটুনীর মুখের দিকে তাকাল গুপী। তার চোখদুটো জিজ্ঞাসু এবং সন্ধানী।

'সব কথা।'

ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'ছেইলেবেলাতেই তো মা খেইচিস; তারপর ক্যামন করে এত বড়টা হ'লি? কে তোদের খাওয়াত পরাত—দেখাশুনো করত? সব কইবি কিন্তুক—'

অর্থাৎ ভাঁটুনী বুড়ী তার আশ্রয়দাতা এই ছেলেদুটি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত কথা জেনে নিতে উৎসুক। আগ্রহে তার কর্কশ, তামাটে মুখটা চকচক করছে।

গুপী বলল, 'আমাদের কথা শুনে লাভ নেই পিসী।'

ভাঁটুনী ঝেঁঝে উঠল, 'লাভ-ক্ষতি আমি বুঝব। তোর কওয়ার কথা, তুই কইবি।'

'এতই য্যাখন তুমার ইচ্ছে ত্যাখন শোন—' গুপী শুরু করল, 'মা য্যাখন মরল ত্যাখন আমরা একেবারে ছেল্যামানুষ; জ্ঞেয়ান-বুদ্ধি কিচ্‌চু হয় নি। ত্যাখনকার কথা আমাদের মনে নেই।

বড় হইয়ে আমুষের মুখে য্যামন য্যামন শুনাচি ত্যামন ত্যামন কইচি।,

'বল —'

'মা মরবার পর সব আঁধার হয়ে গেল পিসী। আপন কইতে আমাদের আর কেউ রইল নি।'

ভাটুনী বলল, 'মা না হয় মরেছেল, বাপ তো ছেল। সে তো তুদের আপনার লোক।'

'বাপ এট্টা ছেল ঠিকই। সে উই নামেই।' খুব আস্তে কথা ক'টা বলল গুপী। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

'কী কইচিস গুপী!'

'খাঁটি কথাই কইচি।' গুপী বলতে লাগল, 'বাপের অক্ত (রক্ত) আমাদের শরীলে রয়েচে, সে আমাদের পিরথিমীতে এনেচে, খুব সত্যি কথা। তবু সে আমাদের আপন লয়। আপন তো লয়ই, কেউ লয়। পরের চাইতেও পর। সে আমাদের শত্তুর।' ক্ষোভে-দুঃখে-উত্তেজনায় গুপীর গলা বুজে গেল।

'অমন করে কইচিস কেন গুপী? কী করেচে তুদের বাপ?' ভাটুনী শুধাল।

'বাপের কথা শুদিও নি পিসী।'

'কেন রে?'

'তার কথা কইতে লজ্জা হয়, তাকে বাপ ডাকতে ঘেন্না হয়—'

গলার স্বরেই বোঝা গেল, নিজের বাপ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই গুপীর। বরং বিরাগ এবং বিতৃষ্ণা এত বেশি যাতে পারতপক্ষে বাপের কথা সে বলতেই চায় না।

ভাটুনী বলল, 'হাজার হোক বাপ তো, জন্মদাতা। য্যাত ঘেন্নাই হোক তবু বাপ বলে তাকে না মেনে পারবি? কেউ যদি শুদোয় তুরা কার ছেইলে গো, কে তুদের বাপ, ত্যাখন কী কইবি?'

গুপী উত্তর দিল না।

ভাঁটুনী থামে নি, 'য্যাত মোন্দই হোক, য্যাত খারাপই হোক তভু তো তুদের এট্টা বাপ আচে। দশজনার কাচে মাথা তুলে কইতে পারবি, এই আমাদের বাপ গো। আমরা এর ছেইলে। কিন্তুক আমার কথা ভাব দিকি। সারা জনমে একবার বাপ ডাকতে পারলম নি। কারোকে দেখিয়ে কইতে পারলম নি, এই আমার বাপ গো, আমি এর মেইয়ে—'

অসহ্য আবেগে ভাঁটুনীর গলা কাঁপতে লাগল।

এরপর একটু চুপ।

এদিকে রাত আরো বেড়েছে। আজ কি তিথি, কে বলবে। খুব সম্ভব শুক্লপক্ষের পঞ্চমী কি ষষ্ঠী। উঠোনের এককোণে যে নিঃসঙ্গ মাদার গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তার আঁকাবাঁকা ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে নজর চালালে দেখা যাবে, এক ফালি চাঁদ উঠেছে কিন্তু ওঠাই সার। হেমন্তের কুয়াশা আর অন্ধকার ষড়যন্ত্র করেছে, চাঁদটা থেকে এককোঁটা আলোও গুপীর উঠোন অবধি পৌছতে দেবে না। হঠাৎ ভাঁটুনী বলে উঠল, 'ঢের রাত হয়েচে। নে, তুদের কথা বল—'

নিজের মনে কি যেন ভাবছিল গুপী। ভাঁটুনীর কথা শুনে চমকে উঠল।

ভাঁটুনী আবার বলল, 'সবার আগে তুদের বাপের কথা কইবি—'

যে বাপ সম্বন্ধে গুপীর এত অশ্রদ্ধা এত বিরাগ, কেমন মানুষ সে? জানবার জন্য অদম্য এক কৌতূহল ভাঁটুনীকে পেয়ে বসেছে।

ভাঁটুনীর গলায় এমন কিছু ছিল যা অমান্য করা যায় না। অগত্যা বাপের কথা দিয়েই শুরু করল গুপী।

গুপী যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম।

তাদের বাপের নাম ব্রজ। লোকে বলে বেরজো।

আকৃতিতে বেরজো ছিল মানুষের মতই। মানুষের মতই হাত-পা-মুখ-চোখ—যেখানকার যা সবই তার ছিল। দেহের গঠনে কোথাও এতটুকু খুঁত ছিল না।

আকৃতিতে বেরজো মানুষ হতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতে সে

একেবারে বিপরীত। একটা ঘৃণ্য পশুর মত। জগতে হেন পাপ নেই যা সে করে নি, হেন নেশা নেই যাতে তার অরুচি ছিল। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে থাকতে হলে কিছু কিছু নীতি, শৃঙ্খলা আর সংযম মেনে চলতে হয়। বেরজো সে-সবের ধার ধারত না। মানুষ হিসেবে সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল, আদিম এবং বেপরোয়া।

কেউ যদি তার স্বভাবের নিন্দে করত, মুখ ভেঙচে খেঁকিয়ে উঠত বেরজো, 'তুদের বাপের পয়সায় লেশা করি, না রাঁড়ের বাড়ি যাই—অ্যাই শোরের বাচ্চারা ?'

ভয়ে কেউ আর কিছু বলত না।

এই বেরজো একদিন বিয়ে করে বসল। সংসারী হল। অমোঘ নিয়মে ছেলেপুলেও হল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

সংসার সম্বন্ধে বেরজো ছিল সাঙ্ঘাতিক রকমের উদাসীন। উদাসীনই শুধু না, দায়িত্বহীনও। বউ-ছেলেপুলে কি খাবে, কি পরবে, সে দায় যেন তার নয়।

গুপী বলতে লাগল, 'আমরা বাঁচলাম, না মরলম, খেতে পেলম কি পেলম নি—কুনো খপরই বাপ রাখত না। পুরো মাসে দশটা দিনও যদি সে ঘরে রইত—'

শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ভাঁটুনী। বলল, 'ঘরে রইত নি তো মড়াটা রইত কুথায় ?'

'সাকদ্বীপ—'

'সেখেনে কী ?'

'সেইখেনেই আমাদের সব্বোনাশ ছিল গো পিসী—'

'সব্বোনাশ !'

'হ্যা, সব্বোনাশ—'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল গুপী। তীব্র চাপা গলায় বলল, 'সেইখেনে মুরলা ছিল। কী মন্তোরহ যে সে জানত ! সব সোময় বাপ তার কাছে পড়ে রইত।'

'মুরলা কে ?' ভাঁটুনীর গলার ভেতর থেকে শব্দ ছুটো যেন

ঽটকে বেরিয়ে এল। রাতকানা, ঘোলাটে চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

গুপী জবাব দিল না।

ভাঁটুনী আবার শুধলো, 'মুরলা কে?'

ভাঁটুনীর কানের মধ্যে মুখটা গুঁজে এবার ফিসফিস করে উঠল গুপী, 'এট্রা লষ্ট মেইয়ে মানুষ—'

বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় ভাঁটুনী কি বলল, বোঝা গেল না।

গুপী, থামে নি, 'হুই লষ্ট মাগীটা য্যাখন দয়া করে ছাড়ত ত্যাখন বাপ ঘরে ফিরত। ফিরো এসেই এট্রা না এট্রা ছুতো ধরে মাকে ঠ্যাঙাত। দুটো-এট্রা দিনও ঘরে রইত কি রইত নি। তারপরেই মুরলার জন্যে তার পেরাণ আকুপাকু করে উটত। মাকে ছেড়ে আমাদের দু-ভাইকে ছেড়ে আবার কাকদ্বীপে দৌড়ুত। আমরা আর কেউ লয়, কেউ লয়। য্যাত আপন কাকদ্বীপের উই লস্থারটা।'

একটু থাকল গুপী। তারপর উঠোনের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব উদাস আর ব্যাথাতুর গলায় বলল, 'এই আমাদের বাপ—'

একটু আগে গুপী তার বাপের কথা বলতে চাইছিল না। কেন যে চাইছিল না, এবার যেন বুঝতে পারল ভাঁটুনী। বেবজোর মত পাপিষ্ঠ অমানুষ বাপের নাম মুখে আনা যে কোন সন্তানের পক্ষেই অসম্মানকর। খুব সম্ভব অন্যায়ও।

একটু চুপ।

উঠোনের দিকে তাকিয়েই আছে গুপী। তার দৃষ্টিটা কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

'গুপী—'

খুব আস্তে, প্রায় অস্ফুট গলায় ভাঁটুনী ডাকল।

'বল—'

মুখ না ফিরিয়েই গুপী সাড়া দিল।

'বাপের কথা তো কইলি। এবেরে তুদের মায়ের কথা বল্, তুদের দু-ভায়ের কথা বল্—'

'মা—আমাদের মা—'

বারকয়েক মায়ের নামটা যেন জপ করল গুপী। আস্তে আস্তে উঠোনের অন্ধকার থেকে চোখ দুটো সরিয়ে আনল। তারপর শুরু করল, 'আমাদের মায়ের নাম পদ্ম। সাত্থোক নাম। লোকের মুখে শুনিচি, মা ছিল ভারি রুপুসী। মানুষের লাকিন অমন রূপ হয় না। খাঁড়ার মতন তার নাক, এত্তো বড় বড় চোখ। আর গায়ের বন্নো (বর্ণ)? বন্নো লয়, সে ছিল আগুন। কপালে সিঁদুর ডগডগ করচে। চুল পিঠ ছাইপ্যা (ছাপিয়ে) কোমর অবধি নেমে এসেচে। যেন দুগ্‌গা পিরতিমে—'

নিজের মায়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে গলাটা কাঁপছে গুপীর। চোখদুটো চকচক করছে। মুখের ওপর অস্বাভাবিক খানিকটা দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

গুপী বলতে লাগল, 'শহর-বাজার ঘুরে এস। আমার মায়ের মতন অমন রূপ চোখে পড়বে নি। লোকে বলে রাজার ঘরেও লাকিন অমন রূপ লেই।'

একটু থামল গুপী। একটু ভাবল। আবার আরম্ভ করল, 'এত্ত তো রূপ! কিন্তুক লাভ কী হ'ল? মা কি আমার বাপকে বেঁধে রাখতে পারত? না। মুরলা মাগী মা'র কাছ থেকে বার বার তাকে কেড়ে লিয়ে যেত—'

গুপীর গলাটা এবার কেমন যেন বিষাদাচ্ছন্ন, করুণ আর মৃদু শোনাল। একটু আগের চকচকে চোখদুটোর ওপর বিষাদের ছায়া পড়ল।

গুপী থামে নি, 'আমাদের দু-ভাইকে ছাড়া আমার মা আমার বাপের কাছ ঠেঙে আর কিছু পায় নি! না এট্টু ভালবাসা, না এট্টু ভালো কথা, না পেটভত্তি ভাত, না একখানা কাপড়। না কইতে কিচ্ছু লয়।'

গুপীর মা তার সোয়ামীর কাছ থেকে দুটি সন্তান ছাড়া আর কিছুই আদায় করতে পারে নি।

'সংসারে পুরুষ মাত্রেই তার বউকে ভালবাসে; আদরে-সোহাগে মগ্ন এবং আচ্ছন্ন করে রাখে। এই হল নিয়ম। কিন্তু কোন নিয়মের মধ্যেই বেরজো পড়ে না। কাজেই সোয়ামীর মমতা যে কি জিনিস, কোনদিনই গুপীর মা জানতে পারে নি।

বেরজো সম্বন্ধে গুপীর মায়ের মনে যা ছিল তা হল বিদ্বেষ, ঘৃণা আর ভয়। নিজের সোয়ামীকে কোনদিনই সে আপন ভাবতে পারে নি। পারার কথাও না।

বেরজোর সঙ্গে এমনিতে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু নেশায় চুর হয়ে যখন সে ঘরে ফিরত, নিজেকে তার বিছানায় সঁপে দিতে হত। না দিয়ে উপায় ছিল না।

একদিন বুঝি গুপীর মা রাজী হয় নি। তার ফল হয়েছিল মারাত্মক। বেরজো তাকে কিছুই বলে নি। ঘরের এককোণে দেড় বছরের গুপী ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আছাড় দিয়েছিল সে। গুপীব-মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। গুপীর মাথায় এখনও সেই কাটা দাগটা আছে।

রক্ত দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল গুপীর মা, 'আমার শরীলটাকে লিয়ে যা ইচ্ছে কর। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও। কিন্তু ছেইলে ছুটোকে কিচ্ছু করো নি। তুমার পায়ে পড়ি—'

গুপীকে আছাড় মারার পর থেকে আর আপত্তি করে নি গুপীর মা। বেরজোর আদিম প্রবৃত্তির কাছে বার বার তাকে ধরা দিতে হয়েছে, কিন্তু তা নিতান্ত অনিচ্ছায়। এই ধরা দেওয়ার মধ্যে তার প্রাণের কোন সায় থাকত না।

বেরজো তার সন্তানের বাপ; তবু যেন কেউ নয়। গুপীর মায়ের সব সময় মনে হত, বেরজো নামে জঘন্য পশুটা তার কাছে অনাত্মীয়, অবাঞ্ছিত পরপুরুষের মত।

যার স্বামী কুচরিত্র, অমানুষ আর হৃদয়হীন তার কাছে জীবন বিড়ম্বনা ছাড়া আর কী? তার বেঁচে থাকার মধ্যে মর্যাদা নেই, সম্মান নেই।

মর্যাদা না থাক, সম্মান না থাক, তবু গুপীর মায়ের একটা সান্ত্বনা ছিল। এই সান্ত্বনা হল তার দু'টি ছেলে; গুপী আর মধু। খুব বেশিদিন সে বাঁচে নি। তবু যে ক'টা দিন বেঁচেছিল, সে এই ছেলে-দুটোর মুখের দিকে তাকিয়েই।

'বাপ তো আমার অমন পাপিষ্টি। যা সে রোজকার করত সব কাকদ্বীপের সেই লষ্ট মাগীটার পায়ে ঢেলে দিত। লিজের ছেইলে, লিজের পরিবারকে খেতে দিত নি, পরতে দিত নি। সোমসার যে ভেসে যাচ্ছে, সেদিকে তার লজর ছেল নি।' গুপী বলতে লাগল, 'ইদিকে দুটো ছেইলে নে' মা আমার কী করে! লিজেই বা কী খায়, তাদের মুখেই বা কী দ্যায়! অবিশ্যি অনেকে আমাদের খাওয়াতে পরাতে চেয়েছেল। কিন্তুক সে খাওয়া আর সে পরা বড় লজ্জার, বড় ঘেন্নার।'

ফিস ফিস গলায় ভাঁটুনী শুধলো, 'কি রকম—'

'রকমটা বুঝতে পারচ নি?' মুখ তুলে ভাঁটুনীর দিকে তাকাল গুপী।

'না।'

'তা হ'লে শোন। যারা আমাদের খাওয়াতে চেয়েছেল, তাদের মোতলব ভাল ছেল নি। বাপ আমার ঘরে থাকে না, মা যুবুতী, তার ওপর গা-ভত্তি অমন রূপ। বুঝে দ্যাখো পিসী, কিসের টানে তারা আমাদের খাওয়াতে চাইত। কিন্তুক মা আমার খাঁটি সোনা, সাক্ষেৎ ভগমতী। তার ভেতর এতটুকুন খাদ নেই পিসী। য্যাখন লরকের কেন্নোগুলোন খুব বাড়াবাড়ি নাগাল মা চোখ পাকিয়ে রুখে উটল। মা'র চোখপাক দেখে সুড় সুড় করে কেন্নোগুলোন পেলিয়ে গেল।'

একটু চুপ।

মনে মনে কি একটু ভাবল গুপী। আবার শুরু করল, 'কিন্তুক সব মানুষই মতলববাজ আর খাবাপ লয়। ভাল লোকও আচে। লইলে সোমসার অচল হয়ে যেত। এই ধর আমাদের মুরুব্বি, কুঞ্জ জেঠা, বিলেস তাউই। এরা কেউ লাট-বেলাট লয়, রাজা-বাদশা লয়। দু-পাঁচশো মণ ধান-চালও কারুর ঘরে নেই। সবাই মাথার ঘাম

পায়ে ফেলে সোমসার চালায়। তভু য্যাখন তায়া-গোপাল, যেরজোর বউ দুটো ছেইলে নে বিপাকে পড়েচে, কাচে এসে দাঁড়াল। ভরসা দিল। শুদু মুখের ভরসাই নয়, যে যা পারল, চাল-ডাল-পয়সা, সব দিল। এই দেওয়ার ভেতর তাদের স্বাথ ছেল নি, মতলব ছেল নি। পেরাণের টানে তারা দিয়েচে।'

'মুরুব্বিরা যা দিত, মা কিন্তুক কিছুই খেত নি। আমি ত্যাখন বড়, ভাত খেতে শিকিচি। মা আমাকেই সব খাওয়াত। মধু ছোট ; সে তো বুকের দুধই খেত। উদিকে না খেয়ে খেয়ে আমার মা, অমন দুগ্‌গা পিরতিমে, শুকিয়ে কালো আঙরা (অঙ্গার) হয়ে গেল।'

ভাঁটুনী বলল, 'আহা রে—'

ভাঁটুনীর কথা বোধ হয় শুনতেই পায় নি গুপী। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে বলে যাচ্ছে, 'কিন্তুক মানুষের শরীল তো ; না খাওয়া আর কদ্দিন সয়। একদিন মা আমার চোখ বুজল !' বলতে বলতে গলাটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল গুপীর।

ভাঁটুনী আবার বলল, 'আহা রে—' স্বরটা যেন তার হৃদ্‌পিণ্ডের গভীর থেকে উঠে এল।

গুপী থামে নি। ধরা-ধরা, কাঁপা গলায় সে বলছে, 'এই আমার মা। য্যাদ্দিন বেঁচে ছেল শুধু কষ্টই পেয়ে গেল পিসী। এ্যাত কষ্ট, এ্যাত যন্তরণা, সব আমার বাপের জন্যে—'

বিড় বিড় করে ভাঁটুনী কি বলল, বোঝা গেল না।

'বাপটাকে যদি একবার পেতম—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল গুপী। তার গলায় একটু আগের ধরা-ধরা কাঁপা ভাবটা নেই। আক্রোশে, উত্তেজনায় চোখদুটো দপ্‌ দপ্‌ করছে।

এর পর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

আবহাওয়াটা বেশ কিছুক্ষণ আগেই গুমোট আর ভারী হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র এত কাছে, তবু এতটুকু বাতাস নেই। কুয়াশা আর অন্ধকারের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে আকাশটা যেন অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে। একটু আগেও মাদার গাছটার

মাথায় যে রাতজাগা মদন পাখিটা থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল, সেটাও চুপ করে গেছে। চারপাশ কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে।

এই মুহূর্তে গুপীর রক্তের মধ্যে তার বাপ সম্বন্ধে যে অব্যক্ত অসহ্য অনুভূতির লীলা চলছে, সেই অনুভূতিটার সঙ্গে চারপাশের আবহাওয়াটার কোথায় যেন সাংঘাতিক একটা মিল আছে।

একসময় ভাঁটুনী বলে উঠল, 'বাপ-মা'র কথা তো শুনলম। এবেরে তুদের কথা বল্—'

গুপী বলল, 'আমাদের আর কথা কি! মা আমার পুণ্যবতী; মরে বেঁচে গেল। বাপও যেন বাঁচল। মা যদ্দিন বেঁচে ছেল, মাসের ভেতর এক আধবার হলেও ঘরে এসত। মরার পর সে বালাই রইল নি। মাকে পুড়িয়ে সেই যে সে কাকদ্বীপ গেল, আর ফিরল নি। আমাব ত্যাখন ত্নু-বছর বয়েস আর মধুর ছ মাস।'

'বাপ তুদের ফেলে পালাল?' ভাঁটুনী যেন আঁতকে উঠল।

'হ্যা—' অস্ফুট গলায় বলল গুপী। বলেই হাসল। তার সেই হাসিটা ঠিক হাসি না। বুকের ভেতর পাক-খাওয়া নিদারুণ এক যন্ত্রণার ছদ্মবেশ!

'মা মরল, বাপ পালাল। তা' পর?' চাপা, দমবন্ধ গলায় ভাঁটুনী শুধলো।

'তা' পরেও আমরা বেঁচে রইলম। কেমন করে জান?'

ভাঁটুনী জবাব দিল না।

গুপী বলতে লাগল, 'উই মুরুব্বি, কুঞ্জ জেঠা আর বিলেস তাউই আমাদের ত্নু ভায়ের দায় লিলে। পালা করে তারা আমাদের রাখতে লাগল। ক'দিন এর ঘরে ক'দিন ওর ঘরে; এই করে করে দিন যেতে নাগল।'

একটু থামল গুপী। কি ভাবল। আবার শুরু করল, 'ত্নু ভায়ের ভেতর আমি বড়। ভাত খাই, মাছ খাই। আমার ঝামেলা কম। কিন্তুক মধুকে নে' ভারি মুশকিল। সে ছ-মাসের বাচ্চা, যাখনত্যাখন তার ত্নুধের তেষ্টা। কিন্তুক তার তেষ্টা কে মেটায়? বুকের ত্নুধ না

পেলে সে যে মরে যাবে। মধু মরেই যেত। কিন্তুক মাথার ওপর ভগমান আচে। মধুর তেষ্টা মেটবার ব্যোওস্থা হ'ল।'

ভাঁটুনী বলল, 'কী ব্যোওস্থা ?'

গুপী বলল, 'কুঞ্জ জেঠার বউর বছর বছর ছেইলে হত। সারা বছর তার বুকভত্তি দুধ থাকত। বুকের এট্টা পাশ সে নিজের ছেইলেকে দিত, আরেট্টা পাশ দিত মধুকে। বুকের দুধ পেয়ে মধু বেঁচে গেল।'

ভাঁটুনী বলল, 'তা' পর ?'

'তা' পর আমরা এট্টু বড় হলম। জ্বোয়ান-বুদ্ধি হ'ল। এ সময়টা দু ভাই দিনরাত ভগমানকে ডাকতম। কইতম, 'হেই ভগমান, আমাদের তাড়াতাড়ি আরো বড় করে দাও।' ভগমান আমাদের কথা শুনলে। দু ভাই গায়ে-পায়ে বেড়ে উঠলম। কাজকম্ম শিখলম, রোজগার শিখলম।'

গুপী সমানে বলছে, 'জন্মেছিলম মৌভোগে। সেকেন ঠেঙে সুকচর এলম। সুকচর ঠেঙে হালিদগঞ্জ (হ্যালিডেগঞ্জ)। তা' পর পাতিবুনে। পিরথিমী ঘুরতে ঘুরতে শেষ অবদি সমুদ্দুরের মুকে এইচি। একখানা ঘর তুলে লিইচি। এট্টু জমিন হয়েচে। দু ভাই রোজকার করি। এখন আর কুনো কষ্ট লেই।'

নিজেদের জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় কথা শেষ করে গুপী ভাঁটুনীর মুখের দিকে তাকাল।

আস্তে আস্তে ভাঁটুনী বলল, 'এই বুঝিন তুদের কথা—'

'হ্যা। তবে—' বলেই থামল গুপী। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ছে তার। পরমুহূর্তেই সে শুরু করল, 'জান পিসী, আমাদের ঘর হয়েছে, মাটি হয়েছে। কষ্ট বল অভাব বল, সবই ঘুচেচে, তভু—'

'তভু কী ?'

'সারা জীবন আমাদের এট্টা দুঃখু থেইকে গেল।'

'কিসের দুঃখু রে ?'

'বাপ-মা যে কী জিনিস, কুনোদিন বুঝলম নি, জানলম নি।' বলতে বলতে গলাটা গাঢ় হয়ে এল গুপীর।

ভাটুনী কিছু বলল না। এই মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতির গভীরে একটা অব্যক্ত ভাবনার খেলা চলছে। সে ভাবছে, গুপী আর মধু নামে এই ছেলেছুটোর সঙ্গে তার জীবনের কি অদ্ভুত মিল। বাপ-মা থাকার স্বাদ তারাও পায় নি, সে-ও পায় নি।

বাপের উদাসীনতা কিংবা মায়ের মমতা, যেটুকুই বা তারা পেয়েছে তাও সজ্ঞানে নয়। তখন তারা একেবারেই অবোধ; নিতান্তই শিশু। মনে রাখার মত বয়স হবার আগেই তাদের মা মরেছে, বাপ পালিয়ে গেছে। বড় হয়ে কোনদিন তারা মা-বাপকে দেখে নি।

সব দুঃখের পরেও তবু গুপীদের একটা সান্ত্বনা আছে। বাপ-মায়ের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই না পাক অন্তত একটা পরিচয় তারা আদায় করতে পেরেছে। লোকের সামনে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে তারা বলতে পারবে, 'আমরা বেরজো গায়েনের ছেইলে, আমাদেব মায়ের নাম পদ্ম।'

কিন্তু ভাঁটুনীর সেই সান্ত্বনাটুকুও নেই।

ভাবনাটা কতক্ষণ চলত কে জানে। হঠাৎ গুপী ডেকে উঠল, 'পি

'বল্—' খুব আস্তে ভাঁটুনী সাড়া দিল।

'ভগমানের ইচ্ছেয় তুমি য্যাখন এসেই পড়েচ, ত্যাখন থাক। যে কটা দিন বাঁচো, আমাদের ছেড়ে যেও নি।'

ভাঁটুনীর কানের কাছে মুখ এনে খুব করুণ আর তৃষিত গলায় গুপী বলল, 'আমাদের ছেইড়ে যাবে নি তো?'

'না, যাব নি।' ভাঁটুনী বলল।

এরপর একেবারেই চুপচাপ। হ্যারিকেনটা কখন যেন নিবে গেছে।

রাতকানা ভাঁটুনী অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে গুপী আর মধুকে বার করল। তাদের ছুঁয়ে বুঝি বা মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবল, যত-দিন সে বাঁচবে, এই ছেলেছুটিকে অপার স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখবে।

ভের

এখন বিকেল।

হেমন্তের আকাশটা ময়ুরের মত পেখম মেলে আছে। লাল-নীল-হলুদ, রঙে রঙে বেলা শেষের বাহার খুলেছে।

সেই সকাল থেকে একটা পাখি ডাকছে। কি পাখি এটা? খুব সম্ভব শামকল। ডেকে ডেকে পাখিটা সারা হয়ে যাচ্ছে।

নিশির ঘরের সামনে একটু উঠোন মত। কি আশ্চর্য! উঠোনটার এক কোণে একটা প্রকাণ্ড শিমূল গাছ। এখানে, এই নোনা হাওয়া আর নোনা জলের রাজ্যে অন্য সব গাছ কোনরকমে টিকে থাকে। কিন্তু শিমূলটা অজস্র স্বাস্থ্য নিয়ে প্রবলভাবে বেঁচে আছে।

শিমূল গাছটার ডালে একটা ছেঁড়া জাল ঝুলিয়ে নিয়েছে নিশি। এমনভাবে ঝুলিয়ে নিয়ে কাজ করতে ভারি সুবিধে।

মাঝ বরাবর জালটা অনেকখানি ফেঁসে গিয়েছে। ফাঁসা জায়গাটা মেরামত করছে নিশি। সুতোর ফাঁস পরিয়ে চৌকো চৌকো ঘর বুনে যাচ্ছে।

নয়া বসতের মাছমারাদের নতুন জাল বুনে দেয় নিশি। পুরনো জাল মেরামত করে দেয়। যোগেন মরার পর এ-ই তার জীবিকা।

ছেঁড়া জালটা কুবের মুরুব্বির। কাল ভোরে সে আসবে। আজই জালটা ঠিক করে রাখতে হবে।

শামকল পাখিটা সমানে ডাকছে।

নিশি বিড় বিড় করতে লাগল, 'থাম্ বাপু। জ্বালাস নি। এখন তোর ডাক শোনার ফুরসুত লেই।'

মাথার ওপর হেমন্তের রঙবাহারি আকাশ। একবারও সেদিকে তাকাচ্ছে না নিশি। এখন আকাশের বাহার দেখার সময় কোথায়?

তা ছাড়া কার্তিকের এই শেষ বেলাটার আয়ু কতটুকু? একটু

পরেহ এহ রঙচঙ এই বাহার আর থাকবে না। আকাশের ময়ূর ডানা মুড়ে ফেলবে।

নিশি ভাবল, দিনের আলো থাকতে থাকতে জালটা সেরে ফেলবে। সন্ধ্যের পর একবার গুপীর ডেরায় যেতে হবে।

একটা অজানা অচেনা বুড়ীকে নিজের সংসারে ঠাঁই দিয়েছে গুপী। বুড়ীটা কেমন মানুষ—একবার দেখে আসা দরকার।

ক'দিন ধরেই গুপী আসছে। বুড়ীটাকে দেখে আসার জন্য সমানে তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু সময় করে যেতে পারছে না নিশি। নানা ধান্দায় ক'দিন সে ব্যস্ত ছিল।

আজ নিশি ঠিক করেছে, সন্ধ্যের পর যেমন করে হোক, গুপীর ডেরায় যাবে।

দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষিপ্র হাত চালিয়ে জালটা রিপু করতে লাগল নিশি।

'হেই, শা—যুগেনের বউ—' হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল।

যোগেন মরার পর থেকে নিশির ইন্দ্রিয়গুলো খুব সজাগ হয়ে উঠেছে। এক ডাকেই সে শুনতে পেল। ঘুরে বসে দেখল, খানিকটা দূরে নটবর দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই শিউরে উঠল নিশি।

নটবর এই নয়া বসতেরই এক বাসিন্দা। যে ঢিবিটার মাথায় নিশির ঘর, ঠিক তার নীচে প্রকাণ্ড এক শিমুল গাছের তলায় নটবরের ডেরা।

যোগেন মরার পর লোকটা নিশির পেছনে লেগেছে।

নটবরের চেহারাটা থলথলে, মাংসল। হাত-পা ফোলা ফোলা। এক নজরেই বোঝা যায়, বাতের শরীর।

লোকটার চামড়া খুব উর্বর। সারা গায়ে প্রচুর লোম, মুখ-ভরতি দাড়িগোঁফ। নাক আর কানের ভেতর থেকে কালো কালো রোঁয়া বেরিয়ে এসেছে।

রোমশ ভুরুর তলায় একজোড়া ধূর্ত চোখ। চোখদুটো এক মুহূর্ত স্থির হয়ে নেই। সব সময় এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজে

বেড়াচ্ছে। খাড়া চোয়াল, থ্যাবড়া নাক। [illegible] আর চোয়ালের মধ্যে লোকটার স্বভাবের ছাপ আছে।

নটবরের বয়েস যে কত, বুঝবার জো নেই। তবে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে তার মাথায় দু-চারটে সাদা চুলের খোঁজ মিলতে পারে।

লোকটা খুব সম্ভব মধ্যবয়সী।

পরনে খাটো ধুতি আর ডোরাকাটা সবুজে ফতুয়া। এই ফতুয়াটার রঙে লোকটার রুচির পরিচয় রয়েছে।

নটবরের স্বভাবে-রুচিতে-চেহারায় কেমন এক ধরণের আদিমতা আর স্থূলতা যেন মিশে আছে।

নিশির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল নটবর। নিশিও এবার তাকাল। চোখাচোখি হতেই নটবর হাসল। ভোঁতা, চাপা গলায় বলল, 'এলম গো মেইয়েছেলে—'

চাপা গলায় নিশি শুধলো, 'কেনে' ?

'শুদু শুদু আসি নি।'

সঙ্গে করে একটা জাল এনেছে নটবর। সেটা দেখিয়ে বলল, 'মাছের ঘাই খেযে জালটা জখম হয়েচে। এট্টু সেরে দাও দিকিনি।'

'রেখে যাও। রাত্তিরে সেরে রাখব'খন। কাল এসে লিযে যেও।'

'কাল লিলে চলবে নি। আজই ঠিক করে দ্যাও।'

নিশি বলল, 'কিন্তুক আরেক জনের কাজ ধরিচি। হাতের কাজ না সেরে তুমারটা ধরি কেমন করে ?'

'য্যামন করে পার. ধর।' নটবর বলতে লাগল, 'আমার এই এট্টা মাত্তর জাল। এটা মেরামত করে না দিলে রাত্তিরে মাছ ধরতে পারব নি। বড্ড ক্ষেতি হয়ে যাবে।'

কি একটু ভাবল নিশি। তারপর বলল, 'আচ্ছা দ্যাও, তুমারটাই আগে সেরে দি।'

নটবর বলল, বাঁচালে—'

শিমূল গাছের ডাল থেকে কুবেরের জালটা নামিয়ে ফেলল নিশি। নটবরেরটা ঝুলিয়ে রিপু করতে বসল। মনে মনে ঠিক

করল, আজ আর [illegible] জালটা ধরবে না। নটবরেরটা সেরে দিয়ে গুপীর ডেরায় চলে যাবে।

শামকল পাখিটা এখন আর ডাকছে না। খাড়ির মুখে নোনা জলের গজরানি ছাড়া এখন কোন শব্দ নেই।

জালটা দিয়ে নটবর চলে যায় নি। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ-সে ডেকে উঠল, 'মেইয়েছেলে—শুনচ—'

'বল—'

না তাকিয়েই নিশি সাড়া দিল।

'কইছিলম কি, তুমি জালটা সারতে থাক। আমি তুমার কাচে বসি।'

তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে নটবরের দিকে তাকাল নিশি। ফিসফিস গলায় শুধল, 'আমার কাচে বসবে! কেন?'

'কেন আবার। এমনি—'

'সত্যি!' ঘাড় বাঁকিয়ে নিশি বলল।

নিশির গলায় এমন কিছু রয়েছে, যাতে নটবর চমকে উঠল। বলল, 'এ-ও-সে, কত লোকই তো তুমার কাচে এসে বসচে। আমি বসলেই দোষ লাকিন?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল নিশি। বলল, 'কে আবার আমার কাচে এসে বসচে!'

'কেন গুপী। রোজই তো তাকে তুমার কাছে আসতে দেখি।' নটবর বলতে লাগল, 'তুমার গা ঘেঁষে সে বসে। গুজগুজ করে কী কয়! খিল খিল করে হাসে! সবই চোখে পড়ে।'

আস্তে আস্তে নিশি বলল, 'গুপীর কথা ছাড়।'

'কেন, ছাড়ব কেন?'

নিশি জবাব দিল না।

নটবর আবার শুরু করল, 'গুপী কাচে বসলে দোষ হয় না। আমি বসলেই য্যাত দোষ! হেই গো—'

'না' দোষের আর কি। তবে—'

'তবে কী? আমি বসলে তুমি অশুদ্ধ, হয়ে যাবে?'

বলেই ভোঁতা কর্কশ গলায় খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল নটবর। যেন খুব একটা দামী রসিকতা করে বসেছে। হাসির তোড়ে তার থলথলে দেহটা কাঁপছে। জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। লোকটার কোন কিছুতে মৃদুতা নামক বস্তুটি নেই। সব কিছু চড়া পর্দায় বাঁধা। একবার হাসতে শুরু করলে সহজে সে থামতে জানে না। অনেকক্ষণ হাসল নটবর। তারপর হয়রান হয়ে একসময় থামল।

নিশি আর কিছু বলল না। বলে লাভও নেই। ঘর থেকে একটা চাটাই এনে সে বিছিয়ে দিল।

যোগেন মরার পর যে কামটগুলো চারপাশে ঘুর ঘুর করছিল, তারা এখন ভোল বদলে ফেলেছে। সবাই উপকারীর ছদ্মবেশে আসতে শুরু করেছে। কেউ ছেঁড়া জাল মেরামত করাতে আসে। কেউ নতুন জাল বুনতে দিয়ে যায়। এই সব অছিলায় যতক্ষণ নিশির কাছে বসা যায়!

এরা মাছমারার জাত।

নিজের নিজের জাল কি তারা বুনে নিতে পারে না? খুব পারে। ছেঁড়া জাল কি সারাতে জানে না? খুব জানে।

তবু নিশিকেই তারা এসব কাজ দেয়। এজন্যে চড়া মজুরি দিতে হয়। তবু দেয়। কেন দেয়, কী মতলবে দেয়, সব বোঝে নিশি। বুঝেও উপায় নেই। মুখ বুজে চুপচাপ থাকতে হয়। যারা কাজ দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে, মাঝে মধ্যে তাদের ইচ্ছাকে একটু-আধটু খুশী করতে হয়। কেউ তার কাছে বসতে চায়। কেউ দরকারের বেশি কথা বলে। নিজেকে সামলে যতখানি পারে লোককে খুশী রাখে নিশি। নইলে কেউ তাকে কাজ দেবে না। নিশি বললে, 'দেঁড়িযে রইলে কেন? চ্যাটাই পেতে দিলম, বোস।'

নটবর বসল না। আড়চোখে একবার নিশির দিকে তাকাল।

কি বুঝল, সে-ই জানে। আস্তে আস্তে শুধলো, 'বসতে চাই বলে রাগ করলে?'

নিশি হাসল। বলল, 'কি যে বল! তুমাদের দিয়ে আমার

রোজকার। তুমরা আমায় খাইয়ে পারিয়ে বাঁচয়ে রাখচ। তুমাদের ওপর রাগ করলে কখনও চলে!'

খুশী গলায় নটবর বলল, 'তা যা কয়েছ—'

'লাও এখন বোস দিকিন।' নিশি বলতে লাগল, 'আমি জালটা সেরে ফেলি।'

নটবর চাটাইর ওপর বসে পড়ল। নিশি আর তার দিকে তাকাল না। ছেঁড়া জালটা নিয়ে মেতে উঠল।

আকাশের ময়ূরটা এখন ডানা মুড়তে শুরু করেছে। হেমন্তের এত রঙ এত বাহার—একটু একটু করে সব মুছে যাচ্ছে।

খানিকটা পরেই সন্ধ্যে নামবে। নিশির হাত দুটো দ্রুত চলতে লাগল। একটানা অনেকক্ষণ জালের গায়ে সুতোর ঘর বুনল নিশি। তারপর একটু থামল। একটা একটা করে দু হাতের দশটা আঙুল ফোটাল। হাই তুলে আলস্য ভাঙল। পাশে বসে নটবর কি করছে, বুঝবার জন্য ঘাড় কাত করে তাকাল। দেখল, জ্বলজ্বলে মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। চোখে পলক পড়ছে না।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে জাল রিপু করতে লাগল নিশি। বুকটা তার কাঁপছে। আবার ভালও লাগছে।

নিশির প্রাণের ভেতর এ এক বিচিত্র লীলা। সে জানে, তার দিকে তাকালে কেউ চোখ ফেরাতে পারে না। সে যদি সামনে থাকে, সাধ্য কি লোকে অন্য দিকে তাকায়।

নটবর মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে। অহঙ্কারে নিশির প্রাণটা ডগমগ। খুব ভাল লাগছে তার।

নিশি জানে, বেশিক্ষণ নটবরের চোখদুটো মুগ্ধ থাকবে না। একটু পরেই লুব্ধ হয়ে উঠবে। সেই ভয়েই বুকটা ঢিবঢিব করছে।

নিশির বুকের ভেতর এই ভয় আর এই ভাল-লাগার বাস পাশাপাশি।

সন্ধ্যের আগে আগেই কাজ শেষ করে ফেলল নিশি। শিমূলের

ডাল থেকে জালটা খুলে নটবরের কাছে রাখল। বলল, 'এই লাও তুমার জাল। ভাল করে দেখে লাও।'

নটবর বলল, 'দেখতে হবে নি।'

এবার হাত পাতল নিশি। বলল, 'আমার মজুরিটা চুকিয়ে দ্যাও।'

ট্যাঁক থেকে একটা চকচকে আধুলি বার করল নটবর। নিশির হাতে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আচে?'

'না। মজুরি অত লয়।'

'তবে কত?'

'ছ আনা।'

'তা হোক, আট আনাই লাও।'

'আট আনা লোব কেন? যা ন্যায্য, তাই দ্যাও।' নিশি রেগে উঠল। বলল, 'বেশি দিতে চাইচ। তুমার মতলবখানা কী?'

নরম গলায় নটবর বলল, 'আহা চটছ কেন? খুশী হয়ে দু গণ্ডা পয়সা বেশি দিচ্চি এর ভেতর মতলবের কী দেখলে!'

'বেশ এবেরকার মতন লিলম। এরপর বেশি দিলে কিন্তুক লোব নি। কথাটা মনে রেখ।' নিশির মুখ চোখ নিস্পৃহ দেখাল।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন।'

নিশি আর কিছু বলল না।

হেমন্তের আকাশ থেকে দিনের শেষ রঙ মুছে গিয়েছে। এখন চারপাশ আবছা হয়ে যাচ্ছে। গুঁড়ো গুঁড়ো হিম পড়তে শুরু করেছে।

জাল নিয়ে বসে রইল নটবর। তার উঠবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ নিশি শুধলো, 'এবেরে উটবে তো?'

'উটব!' একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল নটবর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'বাঃ, ঘরে যাবে নি?'

উদাস গলায় নটবর বলল, 'ঘরে গে (গিয়ে) কী করব? সেকেনে আচেই বা কী? কিচ্ছু লেই, কেউ লেই। তুমার ঘরের

মতন আমার ঘরটাও ফাঁকা। একেবারে ঢু'-ঢু'—' বলে দু-হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে লাগল।

নিশি চুপ করে রইল।

নটবর বলতে লাগল, 'তুমি তো সব কথাই জান। দু-সাল আগে বউটা মরল। সেই ঠেঙে ঘরে কোন মজা লেই। এক আধটা ছেলেপুলেও যদি থাকত!'

দু-বছর আগে নটবরের বউ মরেছে। ঘরে ছেলেপুলে নেই। সবই জানে নিশি। তবু ঘটা করে এ সব কথা তাকে শোনাবার অর্থ কী? নটবরের মনে কী আছে, কে জানে।

নটবর এখনও থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে, 'তুমার সনগে আমার বেশ মিল আচে।'

'কি রকম?' নিশি চমকে উঠল।

'তুমার সোয়ামী মরেচে। আমার বউ। তুমার-আমার, দুজনের ঘরই একদম ফাঁকা। তাই লয়?'

নিশি জবাব দিল না।

এদিকে সন্ধ্যে নেমে আসছে। একবার গুপীর ডেরায় যেতে হবে। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল নিশি।

নটবর শুধলো, 'কি গো, মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলে যে! কিচু কইবে তো!'

'কী কইব?'

গাঢ় গলায় নটবর বলল, 'হেই যে শুদোলম, তুমার আর আমার ভেতর খুব মিল। কথাটা খাঁটি কি না?'

নটবরের গলার গাঢ়তা গ্রাহ্যই করল না নিশি। বলল, 'উ-সব কথা বুঝি না বাপু। জাল সারাতে এয়েছিলে। সেরে দিইচি। সম্পক্ক চুকে গেচে।'

'এত তাড়াতাড়ি সম্পক্ক চুকিয়ে দিচ্চ?' নটবর ফিসফিস করল, 'কত আশা লিয়ে এসেচি। তুমার কাচে এট্টু বসব। দু-চারটে সুখ-দুঃখুর কথা কইব।'

একদৃষ্টে নিশির দিকে চেয়ে আছে নটবর। একটু আগে নিশি যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তা-ই। নটবরের চোখ দুটো আর জলজ্বলে নেই। কেমন যেন ঘোলাটে আর লোভী হয়ে উঠেছে। এই চোখকে নিশির যত ভয় তত ঘেন্না।

নটবরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার গায়ে কাঁটা দিল।

খাড়ির দিক থেকে সাঁই-সাঁই বাতাস ছুটে আসছে। এলো-প্যাথাড়ি, উন্মাদ বাতাস। নিশির ঘরের চালটাকে সমানে ঝাঁকাচ্ছে! এই সন্ধ্যেবেলায় বঙ্গোপসাগরের বাতাসকে যেন নিশিতে পেয়েছে। শিমূল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে নিশি। নটবর ডাকল 'অত দূরে দেঁড়িয়ে রইলে যে, হেই গো মেইয়েছেলে। কাচে এসে বোস না।'

'না-না—' নিশি আঁতকে উঠল।

'কাচে বসলে গিলে ফেলব লাকিন? আমি বাঘ না ভাল্লুক? অত ডরাচ্চ কেন?'

মুখে কিছু বলল না নিশি। মনে মনে ভাবল, আসল বাঘ-ভাল্লুক হলে ভয় ছিল না। মানুষ বলেই যত ভয়।

নটবর আবার ডাকল, 'এস-এস—'

নিশি কাছে এল না। বলল, তুমি এবেরে ওট তো। আমার কাজ আচে!'

'কী কাজ?'

দাঁতে দাঁত চাপল নিশি। রুক্ষ, কর্কশ গলায় বলল, 'সে খোঁজে তুমার দরকার কী?'

'দরকার লেই, আবার আচেও।'

'কি রকম?'

ভুরু কুঁচকে নটবরের দিকে তাকাল নিশি।

'রকমটা নাই বা শুনলে।'

একটু চুপ।

হঠাৎ নটবর বলল, 'নিজে থেকে তো আর কইলে নি। কিন্তুক তুমার কাজটা যে কী, আমি জানি।'

'কী জান'?'

'গুপীর ডেরায় যাবে তো?'

নিশি চমকে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি জানলে কেমন করে?'

নটবর জবাব দিল না। খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল। হাসির শব্দটা নিশি-পাওয়া বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

হাসির তোড় একটু কমলে বলল, 'তুমায আব আটকে বাকব নি। যেখেনে যাবে, যাও। আমি উটি।'

বাঁ হাতে জাল ঝুলিয়ে নটবব উঠে পডল। তিন পা সামনেব দিকে এগিয়ে চাব পা পিছিয়ে এল। কি একটু ভাবল। তাবপব বলল, 'তুমি যা ভেবেচ, তা কিন্তুক হবে নি।'

নটবব কী বলতে চায়, ঠিক বুঝে উঠতে পাবল না নিশি তবু বলল, 'কী হবে নি?'

'কইব, পর কইব।'

আবও একটু এগিযে এল নটবব। নিশির কাছে ঘন হযে দাঁড়াল। তাব কানে মুখটা গুঁজে ফিস ফিস গলায় বলল, 'গুপীব আশা তুমি ছেড়ে দাও। তাব ওপর মুরুব্বির লজব পডেচে। নিজেব মেইয়ের সনগে সে তার বে দেবে।'

'আব কিছু কইবে?'

'কইছিলাম কি, এই কাঁচা বয়েস। একা একা থাকো, এটা কিন্তুক ঠিক লয়। কী বল?'

নটবব ভেবেছিল, তার কথায় নিশি সায দেবে। কিন্তু ফল উল্টো হল! নিশি ফুঁসে উঠল, 'কোনটা ঠিক আব কোনটা ঠিক লয়, আমি বুঝব। তুমায় অত ভাবতে হবে নি। এখন যাও তো।'

'যাচ্চি যাচ্চি। কিন্তুক যাবাব আগে একটা কথা শুনে লাও।'

'বল।' নিশির গলায় বিতৃষ্ণা ফুটল।

'তুমার সন্‌গে কিন্তুক আমার সব চাইতে বেশি মিল। তুমাব সোয়ামী মরেচে, আমার বউ। এমন মিল আর কুথাও পাবে নি। কথাটা মনে রেকো।'

আর দাঁড়াল না নটবর। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল

নটবর চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সেই থেকে শিমুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে নিশি। কী ভাবছে, সে-ই জানে।

এতক্ষণ সুরুলে পাখিটা চুপ করে ছিল। হঠাৎ সে ডেকে উঠল।

চমকে আকাশের দিকে তাকাল নিশি। সন্ধ্যে পার হয়ে কখন যে রাত্রি নেমেছে, তার হুঁশ ছিল না। হিমে, কুয়াশায় আর আবছা আবছা চাঁদের আলোয় চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

নিশি ভাবল, আজ আর গুপীর ডেরায় যাবে না।

চোদ্দ

নয়। বসতের মাছমারারা সকালবেলা হাটে যায়; সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে। এসেই কুবেরের ডেরায় গিয়ে জমে। নানা সমস্যা নিয়ে সেখানে পরামর্শ চলে। কোন কোন দিন প্রাণে ফুর্তি থাকলে গানবাজনাও হয়। গানবাজনা বা পরামর্শের পর যে যার বাড়ি চলে যায়। গিয়েই খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে খাড়িতে মাছ ধরতে বেরোয়। শীত নেই বর্ষা নেই, এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন।

যথারীতি জাল আর হারিকেন নিয়ে খাড়িতে এল গুপী। অন্য দিন মধু সঙ্গে থাকে, কিন্তু আজ সকাল থেকে তার জ্বর-জ্বর ভাব। কাজেই গুপীকে একা আসতে হয়েছে।

অন্য সময় খাড়ির মুখে নোনা জল গজরায়, ক্ষ্যাপা বাতাস ছুটতে থাকে। এখন জলের গজরানি নেই, বাতাসের শাসানি নেই। খাড়িটা আজ খুব শান্ত। কে যেন মন্ত্র পড়ে তার সব মত্ততা থামিয়ে দিয়েছে। মত্ততা থেমেছে কিন্তু অস্থিরতা একেবারে যায় নি। সমস্ত খাড়ি জুড়ে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ উঠছে।

খাড়ির পাড়ে মেমো বন। একটা গাছের সঙ্গে গুপার ডোঙটা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো তাকে ইচ্ছামত দুলিয়ে যাচ্ছে।

দড়ির বাঁধন খুলে ডিঙিতে এসে উঠল গুপী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার হ্যারিকেনটা নিবল। ওটাতে তেল ভরে আনতে ভুলে গিয়েছিল সে।

গুপী বিড়বিড় করে উঠল, 'যাঃ শালা, আসতে না আসতেই নিবে গেলি! তা বাপু ঘরে ফিরে এ্যাখন তুকে তেল গেলাতে পারব নি। তুই উপুসীই থাক। আঁধারেই আজ আমি মাছ ধরব।' বলেই ডিঙিটাকে খাড়ির মাঝামাঝি নিয়ে গেল। তারপর জাল ছুঁড়ল। আজ কুয়াশার দাপট নেই। অন্ধকারটাও তেমন গাঢ় নয়। আকাশে অষ্টমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। যেটুকু কুয়াশা আর অন্ধকার আছে তার সঙ্গে চাঁদের আলো মিশে সব কিছুকে রহস্যময় করে তুলেছে।

খাড়িটা আজ যেন কুহকিনী। আলো-আঁধারিতে তার ঢেউ-গুলো চিকচিক করছে। কান পাতলে শোনা যাবে, তার বুক জুড়ে ফিসফিসানি উঠছে। দুর্জ্ঞেয় ভাষায় খাড়িটা অবিরাম কী যে বলছে, হাজার চেষ্টা করেও বোঝা যায় না।

জাল বাইতে বাইতে একবার চারদিকে তাকাল গুপী। খাড়িময় অনেকগুলো আলো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আলো-গুলো জেলে ডিঙির। গুপী একাই শুধু নয়, নয়া বসতের অন্য মাছমারারাও এসেছে।

আচমকা, অনেক দূরে খাড়ির আরেক প্রান্ত থেকে কুবের হাঁকল, 'লটা, কুঞ্জ, গুপী—সব্বাই তুরা এইচিস ?'

রোজই মাছ ধরতে ধরতে সবাইকে ডাকে কুবের। ডেকে ডেকে তাদের খোঁজখবর নেয়।

নানা দিক থেকে সাড়া উঠল, 'হ্যা গো, এইচি।'

'ক্যামন মাছ পড়চে তুদের জালে ?'

'খুব।'

'আমার জালেও খুব পড়চে রে। কাল হয়েচে জোয়া সব্বাই
া পয়সার মুখ দেখতে পাবি, কী কো'স (বলিস) ?' কুবেরের গলাটা উল্লসিত শোনাল।

'হ্যা।' একসঙ্গে সকলে সায় দিল।

টুকিটাকি আরও দু-একটা কথা হল। তারপর যে যার জাল বাওয়ায় মন দিল।

রাতদুপুরে খাড়িতে এসেছিল গুপী। দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। অঘ্রানের রাতটা ঢিমে তালে ভোরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

জাল বাইতে বাইতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল গুপী। নোনা জলে হাত-পা সিঁটিয়ে অসাড় হয়ে গেছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য ডিঙিটাকে পারের দিকে নিয়ে এল সে। গেমো গাছের শিকড়ে সেটাকে বেঁধে গলুইর ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে আয়েশ করে টানতে লাগল।

গুপীর মনটা ভারি খুশী। কেন না, জালে আজ প্রচুর মাছ পড়েছে। মাছে মাছে ডিঙির পেটটা আধাআধি ভবে উঠেছে।

বিড়িতে শেষ সুখটানটি দিয়ে প্রাণের ফূর্তিতে বেসুরো, বেতালা এবং চড়া গলায় গুপী গেয়ে উঠল—

মনের ভেতর আচে আরেক মন,
মন সে তো লয়, সে যে গহীন বন।
বন্দু গো, সেই বনেতে আগুন জ্বলে—
ফিরে ছাখো না।
এ কি যন্তরণা॥

খাড়ির পাবে গেমো গাছগুলো অশরীরী ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে চাপা গলায় কে যেন খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

চমকে ঘুরে বসল গুপী। হাসিটা হঠাৎ শুরু হয়েছিল, হঠাৎই থেমে গেল।

অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইল গুপী। কিন্তু খাড়ির ফিসফিসানি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আবার গান ধরল সে—

দিবানিশি অষ্টপহর,
তুঁষের পোড়া বুকের ভেতর!
বন্দু গো পুড়ে পুড়ে আঙরা হলম
তভু ধরা দ্যাও না।
এ কি যন্তর্‌ণা॥

গেমো বনে আবার সেই হাসি উথলে পড়ল। হাসতে হাসতেই কে যেন বলল, 'বন্দু বুঝিন ধরা দ্যায় না?'

'কে?' রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল গুপী।

'আমি গো, আমি—।' গলার স্বরে এবার চেনা গেল: নিশি।

তাড়াতাড়ি ডিঙি থেকে নেমে এল গুপী।

নিশি বলল, 'কই. আমার কথাটার জবাব দিলে না তো?'

'কোন কথাটার?'

'অই যে শুদোলম, বন্দু ধবা দ্যায় কি-না?'

গুপী থতমত খেয়ে গেল। ক'দিন আগে গগন গায়েনের কাছে একটা গান শিখেছিল সে। আজ প্রাণের খুশিতে সেটা গেয়েছে। কিন্তু গানটা যে এমন বিপদে ফেলবে তা জানা ছিল না। বিব্রত মুখে গুপী বলল, 'ও কথার জবাব হয় না কিন! ও তো গানেব কথা!'

'শুদ্ধু গানের কথাই, তুমার মনেব কথা লয়?' নিশি কাছে এগিয়ে এল।

গুপী উত্তর দিল না।

নিশি থামে নি, 'তুমার মনের কথাও উটাই।'

'কে কইল?'

'কেউ কয় নি।'

'তবে জানলে কী করে?'

নিশি জবাব দিল না।

একটু চুপ।

কি যেন ভেবে নিশি এবার শুরু করল, 'একটা কথা শুনে রাখ ব্যাটাছেলে, ধরা সে কুনোদিনই দেবে নি। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে হবে।'

গেমো বনে আলোছায়ার লীলা চলছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নিশি। কেমন যেন অচেনা আর দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে তাকে।

অনেকক্ষণ নিশির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গুপী। তারপর বলে উঠল, 'উসব কথা এ্যাখন থাক। এ্যাত রাত্তিরে কেন খাড়িতে এয়েচ, তাই বল!'

'এমনি এইচি।'

'মিছে কথা।'

'মিছে কথা!' নিশির গলায় কপট বিস্ময় ফুটল।

'লিচ্চয়।' গুপী বলল।

'তা হলে সত্যি কথাটা কী?'

'সে তো তুমি জান।'

চোখ কুঁচকে কি একটু চিন্তা করল নিশি। বলল, 'সত্যি কথাটা শুনতে চাও?'

'হ্যা।' গুপী মাথা নাড়ল।

'খাড়ির মুখে এ্যাত রাত্তিরে কেন এইচি, বুঝতে পারচ নি ব্যাটাছেলে?' নিশির গলাটা কাঁপা-কাঁপা, আবেগে অস্থির।

'না।' গুপী বলল।

সামনের খাড়িটার মতই ফিসফিসিয়ে উঠল নিশি, 'তুমার খোঁজে গো, তুমার খোঁজে—'

'আমার খোঁজে! কেন?'

'ঘুম আসছিল নি যে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কি?' গুপী উদ্‌গ্রীব হল।

মৃদু রিনরিনে গলায় গুন গুন করে উঠল নিশি—

একলা ঘরে রইতে নারি
বড় বিষম জ্বালা গো।
মনের কথা কেউ বোঝে না,
সে যে বড় দায় গো।

গুনগুনানি থামল। কিন্তু তার রেশটা গেমোবনের আলো-ছায়ার মত কাঁপতে লাগল অনেকক্ষণ।

বিড়বিড় করে গুপী কি বলল, বোঝা গেল না।

নিশি বলল, 'তুমি আমার সনগে যাবে ব্যাটাছেলে?'

'কুথায়?'

'আমি যেখেনে লিয়ে যাব।'

'কুথায় লিয়ে যাবে, তাই বল না।'

'আমার ঘরে। ঘুম আসচে না। চল না বসে বসে গল্প কবি।'

অদ্ভুত, জ্বলজ্বলে চোখে গুপীর দিকে তাকাল নিশি। আবার বলল, 'চল—'

'না—না—' ভীরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল গুপী।

'না কেন?'

'ডর লাগে।'

গুপীর দিকে অনেকখানি ঝুঁকে এল নিশি। অস্থির গলায় বলল, 'সত্যি ডর লাগে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ডর বুকে করেই তুমি থাক। আমি যাই।' আর দাঁড়াল না নিশি। গেমোবনের আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল।

বেশ কিছু দূর চলে গেছে নিশি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল গুপীর। সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকল, 'এট্টু দেঁড়িয়ে যাও মেয়েছেলে—'

নিশি দাঁড়াল। দৌড়তে দৌড়তে তার কাছে এসে পড়ল গুপী।

নিশি উন্মুখ হল। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে শুধলো, 'পেছু ডাকলে যে? যাবে আমার সনগে?'

ভয়ে ভয়ে গুপী বলল, 'না।'

'তবে?' নিশির গলাটা এবার ভারি নিস্পৃহ শোনাল।

'এট্টা কথা ছেল।'

'কী?'

'দশ দিন হ'ল ভাঁটুনী বুড়ীকে ঘরে এনে তুলেছি। রোজ তুমায় কইচি, তাকে এট্টু দেখে এস। সোময় করে চোখের দেখাটাও দেখে আসতে পারচ নি। বল, তুমার কাচে আমার কী অন্যায় হয়েচে?' গুপীর গলা ক্ষুব্ধ শোনাল।

'অন্যায় কিছুই হয় নি।' নিশি বলল।

'তা হলে যাচ্চ নি যে?'

'আজ বিকেলে যাব, ঠিক করেছেলম। কিন্তুক ওই লটবরটা এসে যেতে দিল নি।'

'লটবব এয়েছেল কেন?'

'মরবে বলে। উটার মরণ-পাখা গজিয়েচে যে গো।' অল্প একটু হাসল নিশি।

'কি-রকম?' কাঁপা গলায় গুপী জিজ্ঞেস করল।

'বুঝতে পারচ নি?'

'না।'

'পুরুষ মানষের কি-রকম করে মরণ-পাখা গজায়, এই সোজা কথাটা যদি বুঝে না থাক, আমার সাজ্জি লেই তুমায় বুঝোই। রাত পুইয়ে আসচে, এ্যাখন আমি যাচ্চি।' বলেই চলে গেল নিশি।

চারপাশের গেমো বনে ডাকিনী বাতাস ফিসফিস করছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল গুপী; নিশির কথাগুলো ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে এক সময় চমকে উঠল সে। তবে কি নটবর নিশির দিকে—

নটবরের ভাবনা শেষ হল না। আচমকা গুপীর মনে হল, আজ নিশির সঙ্গে তার ঘরে গেলেই হয়ত ভাল হত। ভয়ের বশে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি।

পনের

সব নদীই নাকি সমুদ্রে মেলে। এদিককার সব পথটা গিয়ে মিলেছে পাতিবুনিয়াতে।

পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—সব দিকেই আবাদ। আবাদ মানেই কালো কালো আদিম মাটি। আদিম বলেই কি মাটির রঙ এত কালো! কে বলবে। প্রকৃতির খামখেয়ালিতে আবাদের মাটি কোথাও সমতল. কোথাও বা উচুনীচু ঢেউখেলানো।

যতদূর চোখ যায়, শুধু প্রান্তর। সে প্রান্তর দিগন্ত পর্যন্ত ধাবিত। মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সব গ্রাম। গ্রামগুলো থেকে যত পথ বেরিয়েছে, সব হেলেদুলে সাপের মত এঁকেবেঁকে সোজা পাতিবুনি-ার হাটে গিয়ে পড়েছে। না গিয়ে উপায়ই বা কী! কেননা এ অঞ্চলে পাতিবুনিয়া ছাড়া আর কোন হাট নেই।

হাটটার শিয়র ঘেঁষে নীল জলের বিশাল নদী। নদীটা বহুরূপী। উত্তরে গেলে দেখা যাবে, তার রঙ গৈরিক। সেখানে তার বিস্তার নেই। দক্ষিণে গেলে দেখা যাবে. সে নীল। যত দক্ষিণে গেছে নীল রঙের গাঢ়তা ততই বেড়েছে। সেখানে শুধু নীলই না. বিপুলও। উত্তরে যে গেরুয়া পরে যোগিণী, দক্ষিণে এসে সে-ই নীলবসনা বঙ্গিনী সেজেছে।

নদীটার শিয়র ঘেঁষে সারবন্দি হাটের চালা। খান দশ পনের চালা নিয়ে মাছের বাজার: কয়েকটাতে আনাজের বাজার।

ধান-চাল-মাছ-আনাজ-জামা-কাপড়—সব কিছুর জন্য আলাদা আলাদা এলাকা।

অন্য দিনের মত আজও জাঁকিয়ে হাট বসেছে। সারা আবাদ উজাড় করে যত গরুর গাড়ি আর যাবত মানুষ, সব পাতিবুনিয়াতে চলে এসেছে।

হাটটার এক পাশে নদী, আরেক পাশে বাবলা বন। বাবলা বনের ছায়ায় গরুর গাড়ি রেখে মানুষগুলো হাটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

এখন পুরোদমে বিকিকিনি চলছে। দরাদরি হাঁকাহাঁকিতে পাতিবুনিয়া সরগরম হয়ে উঠেছে।

মাছের বাজারের এক কোণে দোকান সাজিয়ে বসেছে গুপীরা। গুপীরা অর্থাৎ নয়া বসতের ক'টি বাসিন্দে। গুপী ছাড়াও তাদের মধ্যে রয়েছে কুবের মুরুব্বি, নটবর, বিলেস এবং আরও জনকতক।

সবার সামনেই টাল দিয়ে মাছ সাজানো।

এখন দুপুর। রোদের ধার লেগে মাছের আঁশগুলো জ্বলছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় গুপীদের সামনে ওগুলো মাছ না, চাদি রুপোর স্তূপ

গোটা চারেক বড় ভেটকি আর কিছু পার্শে নিয়ে বসেছে গুপী। নোনা জলের মাছের মধ্যে ভেটকি আর পার্শে হ'ল সবচেয়ে সুরূপ, সবচেয়ে স্বাদু। কাজেই লোভনীয়।

ঘুরে ঘুরে একটা লোক গুপীর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। লোকটা মাছের পাইকার। নাম রসিক। গুপীদের সঙ্গে তার অনেকদিনের কারবার। এখান থেকে সস্তায় মাছ কিনে বরফের বাক্সে পুরে কলকাতায় চালান দেয় সে।

রসিক বলল, 'এ্যাই রে গুপী, মাছ ক'টা দে না—'

গুপী বলল, 'লাও না।'

'লোব তো, দরটা ঠিক কর।'

'তুমিই বল।'

'এট্টা খাঁটি কথা কইব?'

'কী?'

'ওই দু-কুড়ি দশ ট্যাকা করে পাবি।'

দু-কুড়ি দশ অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা মণ।

গুপী জবাব দিল না। মাছের ওপর যে মাছিগুলো উড়ছিল, গামছা নেড়ে তাদের তাড়াতে লাগল।

রসিক আবার বলল, 'কি রে, মুখে কুলুপ আঁটলি যে। কিছু কইবি তো—'

'কিছু কওয়ার লেই।' মাছি তাড়াতে তাড়াতে গুপী জবাব দিল।

'কেন, আমার দরটা তোর পছন্দ হল নি?'

'ক্যামন করে হয়, বল। ও দরে ভেটকি-পার্শে কখনো পাওয়া যায়!'

'তুই কত দর চাইচিস?'

'পুরো তিন কুড়ি।'

রসিক প্রায় আঁতকে উঠল, 'অই বে বাপ, মরে যাব। অত দর হাঁকলে নিঘ্‌ঘাত মরে যাব।'

'মরে তো যাবে কইচ। কলকাতায় এ মাছ বেচে কত লাভ করবে, বল দিকিন।'

'মাইরি গুপী, কিছু লাভ থাকবে নি। বরফের খরচা, গাড়িতে লিয়ে যাবার খরচা—সব দিয়েথুয়ে কিচ্ছু বাঁচবে নি।' গুপীর ছুটো হাত চেপে ধরল রসিক।

গুপী বলল, 'সত্যি কইচ?'

'একশ'বার সত্যি। ভগমানের দিব্যি।'

'তা হলে আর কি! অই দু-কুড়ি দশই লিয়ে লাও।'

গুপীর কাছে আজকের হাটের সবচেয়ে সেরা মাছ রয়েছে। সে যদি একটু চাপ দিত, তিন কুড়ি টাকাই দর পেত। কিন্তু জীবনের আর সব দিকের মত ব্যবসার ব্যাপারেও সে দুর্বল। সেই দুর্বলতার সুযোগটুকু পুরোপুরি নিয়ে নিল রসিক।

রসিক তাড়া লাগাল, 'মাছগুলো তাড়াতাড়ি বোজন (ওজন) করে দে।'

মাছ বেচে হিসেব করে দাম বুঝে নিল গুপী। তারপরে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। আরামে তার চোখ বুজে এল।

খানিকটা দূরে বসে আছে কুবের মুরুব্বি। তার সামনেও মাছের স্তূপ।

কাল রাত্রে ভাল জাতের মাছ পায় নি কুবের। শেলে, ভোলা আর সামান্য কিছু পায়রাতলি ধরেছিল; তাই নিয়ে আজ হাটে এসেছে। মাছ হিসেবে শেলে-ভোলা একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণীর; আদৌ লোভনীয় নয়। বাজারে তাদের দর নেই; চাহিদাও খুব কম। কাজেই কুবের যেমন মাছ এনেছিল তেমনিই পড়ে আছে। ছটাকখানেক ও বিকোয় নি। বিক্রীর আশাও আর নেই। কেননা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছ নরম হয়ে গেছে।

আর কিছুক্ষণ দেখবে কুবের। তারপর মাছগুলো নদীর জলে ফেলে দেবে।

শেলে আর ভোলা মাছের ভাগ্য যে কী, আগে থেকেই কুবের জানত। তাই তাদের জন্য বিশেষ উদ্বেগ নেই। একদৃষ্টে গুপীর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

পাইকারের কাছে গুপী মাছ বিক্রী করল, হিসেব করে দাম বুঝে নিল, তারপর বিড়ি ধরাল। দূরে বসে সব দেখল কুবের। দেখলই শুধু, মুখ ফুটে কিছু বলল না। এই মুহূর্তে তার মনের ভেতর উল্টোপাল্টা কতকগুলো ভাবনা জট পাকাচ্ছে।

সেদিন সারী ক্ষেপে উঠতে কুবের ঠিক করেছিল, দু-চার দিনের মধ্যেই গুপীর ডেরায় যাবে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সঙ্কল্পটা তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। দু-চার দিনের পর আর ও আট-দশ দিন পেরিয়ে গেছে। তবু গুপীর বাড়ি গিয়ে ভামিনীর বিয়ের কথা পাকা করে আসা হয় নি।

গুপীর ডেরায় না যাওয়ার কারণও আছে।

প্রথমত, কুবেরের স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা আলস্য আছে। অন্য কারো ব্যাপারে সেটা ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে তখনই যখন নিজের বউ আর মেয়ের সম্বন্ধে তাকে কিছু করতে বা ভাবতে হয়।

নয়া বসতের তাবত বাসিন্দার যত দায় আর যত ভাবনা সব বয়ে বেড়াচ্ছে কুবের। তাদের কার কিসে সুবিধা কিসে অসুবিধা, তা

নিয়ে দিবারাত্রি তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু নিজের মেয়েটা যে এত বড় হয়ে উঠেছে, তার যে বিয়ে দেওয়া দরকার, সেটা কোন সময়ই কুবেরের মনে থাকে না। ফলে গুপীর ডেরায় তার যাওয়া হয় নি।

দ্বিতীয়, কুবের নয়া বসতের মুরুব্বি। এ জন্য তার খানিকটা অহঙ্কার আছে। বাইরে থেকে সেটা ধরাছোঁয়া যায় না। সেটা তার অস্তিত্বের নিভৃতে সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে।

অহঙ্কারটা কুবেরের কানের কাছে ফিস ফিস করে বলেছে, 'তুমি হলে মুরুব্বি মানুষ। মেইয়ের বে'র কথা কইতে তুমি কেন যেচে গুপীর ঘরে যাবে। যদি যাও, তুমার মান কিন্তুক খোয়া যাবে।'

তৃতীয়, আরো একটা দিক আছে। সেটা কুবেরের মনের দিক। গুপীরা দু-ভাই খুব ছোট, সেই সময় তাদের মা মরেছে, বাপ পালিয়ে গেছে। ছেলেবেলার কয়েকটা বছর গুপীদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়েছে কুবের। তাই তার কেমন যেন একটা বিশ্বাস ছিল, গুপীর কাছে তার যেতে হবে না, কৃতজ্ঞতার বশে গুপীই তার কাছে আসবে। এসে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে যাবে।

কিন্তু গুপী আসে নি। কুবেরও তার বাড়ি যায় নি। ফল হয়েছে এই, মাঝখান থেকে একটা একটা করে বারো চোদ্দটা দিন কেটে গেছে।

মাঝখানের এই দিন ক'টা কিছুই বলে নি সারী। চুপচাপ কুবেরকে লক্ষ্য করে গেছে। কিন্তু যখন সে দেখল, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কুবেরের বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা উদ্যম নেই তখন ক্ষেপে উঠেছে।

ভামিনীর বিয়ে বিয়ে করে আজ সকালে হাটে আসার আগে তুমুল একচোট হয়ে গেছে। অবশ্য যা কিছু হয়েছে, সবই এক তরফা। যা মুখে এসেছে সারী বলেছে আর মুখ বুজে সে সব সয়ে গেছে কুবের। না সয়ে উপায়ই বা কী? উদাসীন, দায়িত্বহীন বাপকে সবই সইতে হয়।

সারী শাসিয়ে দিয়েছে, 'আজকের ভেতর [illegible] সঙ্গে বে'র কথা ঠিক করে আসবে। নইলে—'

সাঙ্ঘাতিক কিছুর আভাষ দিয়ে চুপ করে গিয়েছিল সারী। তার রাগটা যেমন উগ্র তাতে মারাত্মক একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসা আদৌ বিচিত্র নয়।

এখন, এই পাতিবুনিয়ার হাটে বসে গুপীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবছিল কুবের। ভাবতে ভাবতে এক সময় সে উঠে দাঁড়াল। তারপর গুপীর কাছে এসে গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

মৌজ করে বিড়ি টানছিল গুপী। বিড়িটা বেশ কড়া! আরামে তার চোখ বুজে আসছিল।

পাশ থেকে কুবের ডেকে উঠল, 'গুপী, হেই রে—'

গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল গুপী। তারপর চোখ মেলে বলল, 'তুমি মুরুব্বি! লিজের তুকান ছেইড়ে আমার কাচে এসে বসেচ যে!

গুপীর গলায় কিছুটা কৌতূহল, অনেকখানি বিস্ময়।

কুবের বলল, 'হ্যা, তুকান ছেইড়েই চলে এলম।'

'কেন, কিচু দরকার আচে?'

'লইলে কি আর শুতুশুতু এসেচি।'

হাতের বিড়িটা ফুরিয়ে এসেছিল। শেষ সুখটানটি দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গুপী। তারপর ঘুরে বসে সোজাসুজি কুবেরের মুখের দিকে তাকাল। শুধলো, 'কী দরকার মুরুব্বি?'

'কী দরকার তুইই বল্ না' কুবের হাসল।

গুপী জবাব দিল না। একদৃষ্টে কুবেরের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। তার চোখে যুগপৎ সন্দেহ এবং উদ্বেগ।

আরো একটু ঘন হয়ে এল কুবের। গলা নামিয়ে বলল, 'বুজতে পাচ্চিস না?'

'না।' গুপীর গলায় অস্ফুট একটা শব্দ ফুটল।

একটু চুপ।

নিজের মনে কি যেন ভেবে নিল কুবের। তারপর শুরু করল,.. 'কইচিলম কি, অগ্‌ঘান (অঘ্রাণ) মাস তো পড়ে গেল।'

'তাতে কী হয়েছে!' রুদ্ধশ্বাস গলায় গুপী শুধলো। মুরুব্বির ভাবে ভঙ্গিতে কথাবার্তায় কিসের যেন একটা আভাষ পেয়েছে সে।

চারপাশ একবার দেখে নিল কুবের। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে, এ মাসের ভেতর তোর আর ভামির বে'টা হয়ে যাক।'

গুপী কিছু বলল না। কুবেরের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে দূরের নদীটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

দুপুর পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্যটা পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। একটু আগে আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না এমনই ঝকমকানি ছিল তার নীল রঙের। এখন রোদের চেহারা বদলে গেছে। আকাশটাকে আশ্চর্য স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে। তার অথৈ বুকে [illegible] টুকরো ভবঘুরে মেঘ দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কুবের ডাকল, 'আঁই গুপী, নদীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলি যে। আমার কথা শুনচিস?'

'শুনচি, তুমি বল।' মুখ না ফিরিয়েই গুপী বলল।

'ভামিটা বড় হয়ে উটেচে, দামড়ী বাছুরের মতন ঢেই ঢেই করে এখেনে ওখেনে ঘুরে বেড়াচ্চে। এ কিন্তুক ভাল দেখায় না।'

বিড় বিড় করে গুপী কি বলল, বোঝা গেল না।

কুবের বলতে লাগল, 'ইদিকে তোরও বয়স বাড়চে। বে'না করলে আর মানায় না। ঘরে এট্টা বউ থাকা দরকার, বুঝলি। বউ না থাকলে সোমসার ঢিলে-আলগা হয়ে যায়। বউ হ'ল সোমসারের বাঁধুনি।'

একটু থেমে ভেবে আবার বলল, 'তাই কইচিলম, বে'টা তাড়াতাড়ি সেরে ফ্যাল।'

গুপী উত্তর দিল না।

কুবের তাড়া লাগাল, 'মুখ বুজিয়ে বসে রইল সে—'

নদীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গুপী বলল, 'কী করব ?'

'আমার তো ইচ্ছে এ মাসের ভেতরেই তোদের বে'টা হয়ে যাক। তোর ইচ্ছেটা কী, বল্—'

'বে'র জন্যে অত তাড়াহুড়োর কি আচে ! আর ক'টা দিন যাক না।'

এবার রেগে উঠল কুবের 'তোর মতলব তো বাপু বুজতে পাচ্চি না।'

'মতলব !'

বলেই কুবেরের চোখের দিকে তাকাল গুপী। দেখল, স্থির দৃষ্টিতে কুবেরও তার দিকেই তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা যেমন প্রখর তেমনি সন্দিগ্ধ। গুপীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু একটা যেন বুঝবার চেষ্টা করছে কুবের।

চট করে চোখ নামিয়ে নিল গুপী। কুবেরের পলকহীন সন্ধানী দৃষ্টির সামনে নিজেকে ভারি অসহায় বোধ হতে লাগল তার।

'মতলব লয় তো কী !' চাপা অথচ তীব্র গলায় কুবের বলতে লাগল, 'য্যাখনই তোর কাচে বে'র কথা পাড়ি, তুই এক কতা কো'স (বলিস)। জষ্টি মাসে বে'র কথা পাড়লম, তুই কইলি আর ক'টা দিন যাক। এখনও সেই একই কতা কইচিস। তোর মনের ভেতর কী আচে, তুই-ই জানিস।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গুপী। কি ভাবল। তারপর শুরু করল, 'মুখ ঠেঙে কথা ফেললেই তো আর বে' হয় না—'

গুপী কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে কুবের শুধলো, কি রকম ?'

'মেইয়ের পোণের (পণের) জন্যে তো ন' কুড়ি টাকা হেঁকেচ। টাকাটা জোগাড় করে তুমার হাতে দোব তবে তো বে'। গুপী বলল। কুবের কিছু বলল না। খুব মনোযোগ দিয়ে গুপীর কথা শুনতে লাগল।

গুপী থামে নি, 'এ মাসে তো বে' করতে কইচ। ইদিকে আমার হাতে এট্টা পয়সা লেই। এর ভেতর ন' কুড়ি টাকা কুথা ঠেঙে জোগাড় করি, বল দিকিন।'

এবার মুখ খুলল কুবের, 'কী কইচিস গুপী ! দু-ভাই এ্যাদ্দিন

রোজগার কাচ্চস, ছুটো মাত্তর পেট আর ন' কুড় টাকা জমাতে পারিস নি ! এ কথা তুই আমায় বিশ্বেস করতে কো'স (বলিস) !'

কুবেরের মুখে-চোখে এবং গলার স্বরে বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলে গেল।

'বিশ্বেস করা আর না-করা তুমার ইচ্ছে। তুমার ইচ্ছের ওপর তো আমার হাত লেই।' গুপী বলল।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। '

এদিকে সূর্যটা ঢলতে ঢলতে পশ্চিমদিকে আরো অনেকখানি সরে গেছে। আকাশটা এখন টকটকে লাল, আরক্ত। বেলা যত পড়ে আসছে লাল রঙটা তত গাঢ় হচ্ছে।

ওদিকে হাটও ভাঙতে শুরু করেছে। যারা দূর দূর থেকে এসেছিল এরই মধ্যে তারা ফিরে যাচ্ছে। কাছের যারা তারাও আর বেশিক্ষণ থাকবে না।

হাটটার শিয়র ঘেঁষে যে নদীটা তার ওপর সারি সারি মহাজনী নৌকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। নৌকাগুলোকে এ অঞ্চলে বলে 'বোট'। এতক্ষণ বোটগুলো বেকার ছিল। নদীর ঢেউ মাঝে মাঝে তাদের দোল দিয়ে যাচ্ছিল আর তারাও খানিক বিরক্ত হয়ে দুলছিল।

এখন বোটগুলোতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। পাল তুলে সন্ধ্যের আগে আগেই তারা কাকদ্বীপ, নামখানা, দ্বারিকনগরের দিকে পাড়ি জমাবে।

এক সময় কুবের মুরুব্বি শুরু করল, 'বেশ, তোর কথাই না হয় বিশ্বেস করলম। ধরে লিলম, তোর হাতে এট্টা পয়সাও লেই। তাই বলে বে'টা আটকে রইবে লাকিন।'

গুপী শুধলো, 'আটকে তো রইবে না কইচ। তবে কি পোণের (পণের) টাকাটা ছেড়ে দেবে ?'

'ছেড়ে দোব কেনে ?'

'না ছাড়লে বে'র আগে অত টাকা তুমায় ক্যামন করে দোব ?'

'বে'র আগেই যে দিতে হবে, অমন কোন কতা আছে নাকি ?'

'তা হলে ?'

'বে'র পরেই দিস।'

'কিন্তুক—'

'কিন্তুক কী ?—,

'বে' হলেই তো সোমসারের খরচা বাড়বে।' গুপী বলতে লাগল, 'ত্যাখন অতগুলোন টাকা একসন্‌গে করে কবে যে তুমায় দিতে পারব—'

কুবের বলল, 'একসন্‌গে ন' কুড়ি টাকা তোর কাচে কে চেয়েচে ?'

'তবে ?'

'রোজ হাটে এসে মাছ বেচে কিচু কিচু করে দিবি। তা'পর ধর গে এ মাসের শেষ দিগে লোতুন ধান উটবে। ত্যাখন কিচু দিতে পারবি। দেখবি আস্তে আস্তে টাকাটা শোদ হয়ে যাবে।'

যেন অনেকখানি উদারতা দেখিয়েছে এমন ভাব করে গুপীর মুখের দিকে তাকাল কুবের।

গুপী জবাব দিল না। চোখ নামিয়ে নখ দিয়ে মাটিতে আঁকি-বুকি কাটতে লাগল।

কুবের ডাকল, 'অ্যাই বে গুপী—'

মাটি থেকে চোখ না তুলেই গুপী সাড়া দিল, 'কী কইচ ?'

'তা হলে আমি বে'র ব্যাবোস্থা করতে লাগি, কী বলিস ?'

এবাব চোখ তুলল গুপী। বলল, 'ক'টা দিন আমায় ভাবতে ছ্যাও। তা'পর তুমাকে কইব।'

'এর মধ্যে ভাবাভাবির কী আচে ?' কুবের শুধলো। গুপী বলল, 'অনেক কিচু আচে। সে তুমি বুঝবে না।'

একটু চুপ।

কুবেরই আবার শুরু করল, 'এই বে'র ভেতর ভাবনার কিচু লেই। এট্টা কতা ভেইবে ছ্যাখ্‌, গুপী, এই বে'টা কবে হয়ে যেত। সি কি আজকের কতা, ক' বচ্ছর হয়ে গেল। য্যাখন আমরা মৌভোগে কি পাতিবুনেতে ছিলম, ত্যাখনই এ বে' হতে পারত।

হয় নি শুদু আমার জেদের জন্যে। পিতিজ্ঞে করেছিলম, লিজেদের ঘরবসত আর জমিন য্যাত দিন না হচ্চে ত্যাত দিন মেইয়ের বে' দোব নি। এ্যাখন ঘর হয়েচে মাটি হয়েচে, এ্যাখন আর ভাবাভাবি কিসের? ভাবনার জন্যে এট্টা দিনও সোময় তোকে দোব নি।'

গুপী বলল, 'বেশ ভাবতে না হয় না দিলে। দু-একজনের সন্‌গে এট্টু পরামোশ্য করে দেখি।'

'পরামোশ্য করবি।' কুবের অবাক হয়ে গেল।

'হাঁ।'

'কেনে?'

'কেনে আবার—'

গুপী বলতে লাগল, 'বে' বলে কথা; হুট করে করলেই হল! এ তো দু-চারদিনের ছেলেখেলা লয়। সারা জন্মের মতন একজনের সব দায় লিতে হবে। তার আগে দু-চারজনের সন্‌গে এট্টুখানি পবামোশ্য করব নি!'

কুবের বলল, 'পরামোশ্য করে কিচু লাভ লেই গুপী। এ এক-রকম কইবে, সে আরেকরকম কইবে। মাঝখান ঠেঙে তোর মনটা বিগড়ে যাবে। তার চাইতে আমি যা বলি তাই কর।'

'কী করতে কইচ?'

'এ মাসের ভেতর বে'টা সেরে ফ্যাল্। এতে তোর ভালই হবে।'

'তুমি মেইয়ের বাপ, ও কতা তো কইবেই। দেখি, আর কে কী বলে।' বলেই সামনের নদীটার দিকে তাকাল গুপী।

কুবেব কি একটু ভাবল। তারপর শুধলো, 'তা হলে পরামোশ্য তুই কববিই?'

নদীব দিকে চোখ রেখেই গুপী জবাব দিল, 'লিচ্চয়।' একটু থেমে আবাব বলল, 'এট্টা পষ্ট কতা শুনে লাও মুরুব্বি, পরামোশ্য না করে তুমার মেইয়েকে বে' করতে পারব নি। এতে তুমি যাই ভাব।'

গুপী ছেলেটা এমনিতে ভীরু, দুর্বল! কোনদিন কুবেরের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে যেভাবে কথাগুলি

সে বলল, তা যেমন অভাবিত, তেমনি চমকপ্রদ। অনেকক্ষণ মত বসে রইল কুবের। বসে থাকতে থাকতে মনে হল, তার অহঙ্কারে কোথায় যেন নিদারুণ একটা আঘাত লেগেছে।

অহঙ্কারটা অকারণে নয়। প্রথমত, সে মুরুব্বি। সে জন্য তো বটেই। দ্বিতীয়ত, নয়া বসতের বাসিন্দারা তার কথায় ওঠে, তার কথায় বসে। সে যাকে যা বলে, মুখ বুজে সে তাই করে। তার কথা অমান্য করার সাহস কারো নেই। সে কারণেও কুবেরের মনে একটা গোপন গর্ববোধ আছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সেই গর্ববোধটায় ঘা দিয়ে বসেছে গুপী।

নয়া বসতের তাবত মানুষ সবসময় তার বশংবদ হয়ে থাকবে, এটাই যেন নিয়ম। এই নিয়মেই কুবের অভ্যস্ত। কাজেই তার বিশ্বাস ছিল, বলামাত্র এ মাসেই বিয়ে করতে রাজী হবে গুপী। কিন্তু রাজী তো সে হয়ই নি, বরং নানাভাবে টালবাহানা করছে। একবার বলছে, পণের ন' কুড়ি টাকা কোথা থেকে দেবে। আবার বলছে, ক'দিন ভেবে দেখবে। শেষ পর্যন্ত বলছে, দু-একজনের সঙ্গে পরামর্শ না করে বিয়ে করবে না।

ফলে কুবের যত না অবাক হয়েছে, মনে মনে আহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু আহতই না, অপমানিতও।

হঠাৎ কুবের ডাকল, 'অাঁই—'

গলার আওয়াজটা এমনই রূঢ় আর কর্কশ যে গুপী শিউরে উঠল। নদীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কুবেরের মুখের দিকে তাকাল সে। তাকিয়েই ভয় পেয়ে গেল। কুবেরের মুখটা রুষ্ট, ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট।

খুব আস্তে, ভয়ে ভয়ে গুপী বলল, 'কী কইচ?'

'কাদের সন্‌গে পরামোশ্য করবি, শুনি। তারা কারা? তারা তোর কোন কালের উবগারী বন্দু? য্যাখন তোর মা মরল আর বাপ ফেলে পালাল ত্যাখন তারা কুথায় ছেল?' ক্ষিপ্ত গলায় কুবের বলতে লাগল, 'সে শালাদের নাম বল্‌—'

গুপী উত্তর দিল না।

আচমকা ভোঁতা গলায় খ্যাল খ্যাল করে কে যেন হেসে উঠল।

গুপী আর কুবের চমকে সামনের দিকে তাকাল। দেখল, খানিকটা দূরে বসে আছে নটবর; হাসছে। হাসির দাপটে তার থলথলে মাংসল দেহটা দোল খাচ্ছে। (নয়া বসতের আর সবার মত নটবরও মাছের দোকান দিয়েছে।)

কুবের খেঁকিয়ে উঠল, 'আঁই লটা, অমন শোরের (শুয়োরের) মতন হাসচিস যে।'

শুয়োর হাসে কিনা, কে জানে। আর হাসলেও তার আওয়াজটা অবিকল নটবরের হাসির মতই যে হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু কুবের নটবরের হাসির ব্যাপারে শুয়োরের উপমা দিয়েছে। উপমাটা অযথা নয়। নটবরের চেহারা, চাল-চলন—সব কিছুই শুয়োর-জাতীয়। খুব সম্ভব, এ সব দেখেই তার ধারণা হয়েছে, শুয়োর হাসলে তার মতই শোনাবে।

নটবরের হাসি থামে নি। তার হাসিটা এমনই দুর্জয় যে একবার শুরু হলে সহজে থামানো যায় না।

এবার মারমুখী হয়ে উঠল কুবের, 'চুপ করলি লটা—'

অনেক কষ্টে হাসি থামাল নটবর। বলল, 'অ্যাই চুপ করলম।' বলেই উঠে পড়ল। তারপর হেলেদুলে কুবেরের কাছে এসে তার গায়ে গা ঠেসিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

আড়চোখে একবার নটবরকে দেখে নিল কুবের। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'আই শালা, অমন করে হাসচিলি কেনে?'

'কেনে আবার, তুমার কতা শুনে।'

'আমার কতা শুনে!'

'হ্যা গো মুরুব্বি।'

নটবর বলতে লাগল, 'অই যে গুপীকে তুমি শুদোচ্ছিলে কাদের সন্‌গে সে পরামোশ্য করবে, সেই শুনে এ্যামন হাসি পেল সে কি কইব। য্যাত চাপতে যাই, হাসিটা ত্যাত উথলে ওটে।'

বোঝা গেল, দূরে বসে কুবের আর গুপীর সব কথা নটবর শুনেছে।

কুবেরের রাগ পড়ে নি। চড়া গলায় সে বলল, 'শুদোচ্চিলম, তাতে হাসবার কী আছে? আঁই—'

'হাসবার লেই?' চোখ কুঁচকে নটবর বলল।

কুবের জবাব দিল না। স্থির দৃষ্টিতে নটবরের দিকে তাকিয়ে রইল। নটবর কী যে বলতে চায়, ঠিক বুঝতে পারছে না সে।

নটবর আবার শুরু করল, 'মুরুব্বি তুমি কী আঁধা (অন্ধ)?'

কুবের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'আমায় আঁধা কইচিস, তোর বড্ড বাড় হয়েচে দেখচি। জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

'শুদু শুদু রাগ কর নি তো মুরুব্বি। তুমার কতা শুনলে আমি, কেন, সবাই তুমায় আঁধা কইবে।'

'সবাই কইবে?'

'এক শ' বার কইবে।' নটবর বলল, 'চোখ থাকলে নিজেই সব দেখতে পেতে। কাদের সন্‌গে গুপী পরামোশ্য করবে, তা আর শুদোতে না।'

কুবের কিছু বলল না। চুপচাপ নটবরের কথাগুলো শুনতে লাগল।

নটবর থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে, 'দশজনও লয়, পাঁচজনও লয়, গুপীকে পরামোশ্য দেবার লোক মাত্তর একজন। মুখ ফুটে সে য্যাতক্ষণ না কইচে, ত্যাতক্ষণ গুপীর সাধ্যি লেই তুমার মেইয়েকে বে' করে।'

অস্ফুট গলায় কুবের কি বলল, বোঝা গেল না।

নটবর বলতে লাগল, 'গুপীকে যদি জামাই করতে চাও, আগে তাকে ধর।'

কুবের চেঁচিয়ে উঠল, 'সে লচ্ছারটা কে? নাম বল্ তার—'

কাছেই বসে ছিল গুপী। চোরা চোখে একবার তাকে দেখে নিল নটবর। তারপর কানে মুখটা গুঁজে ফিস ফিস করল, 'এ্যাখন নামটা কইতে পারব নি মুরুব্বি। পরশুদিন মোঙ্গলবার। সিদিন রাত্তিরে তুমার বাড়ি যাব। ত্যাখন কইব।'

'সরস্তাদনের চের দোর। তুই এখনই বল—' কুবের অসাহষ্ণু হয়ে উঠল।

'না।'

হাজার পীড়াপীড়ি করেও নামটা জানা গেল না। অগত্যা ক্ষুব্ধ গলায় কুবের বলল, 'তা হলে পরশুদিনই আমার ওখেনে যাস। যাবি কিন্তুক।'

'যাব।' জোরে জোরে মাথা নাড়ল নটবর।

হাট থেকে ফিরে সোজা গগন ওস্তাদের ডেরায় চলে এল গুপী। যোগেন মরার পর গগনই তার সব চেয়ে বড় বন্ধু, সুহৃদ। বিপদের দিনে সে পাশে এসে দাঁড়ায়; সমস্যায় পড়লে পরামর্শ দেয়।

গগন ঘরেই ছিল। গুন গুন করে একটা নতুন গানের সুর ভাঁজছিল।

আগে আগে গগন তাদের মতই খাড়িতে মাছ ধরে পাতিবুনিয়ায় বেচতে যেত। আজকাল আর ও-সব করে না। ইদানীং গান গেয়ে প্রচুর খ্যাতি হয়েছে তার, খাতির হয়েছে। এমনকি রোজগারও হচ্ছে। এক আসর গাইতে পারলে পাঁচ সাতটা করে টাকা মেলে। সে গুণী, সে শিল্পী। কাজেই খাড়িতে মাছ ধরে সেই মাছ মাথায় চাপিয়ে ছ-মাইল দূরের হাটে গিয়ে বিক্রী করতে তার মন সায় দেয় না। গৌরববোধে কোথায় যেন বাধে।

আপাতত গান গেয়ে তার যা আয় তাতে সংসার কোনরকমে চলে। তবে তার ইচ্ছা আছে, শিগগিরই গানের দল খুলবে। তার বিশ্বাস তখন আজকের এই অভাব আর থাকবে না। দল নিয়ে এক আসর গাইতে পারলে সত্তর আশি টাকা পর্যন্ত মিলবে। সেই সুখী, স্বচ্ছল দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে গগন।

বাইরে থেকে গুপী ডাকল, 'গগোন আচিস?'

গুনগুনানি থেমে গেল। গগন বলল, 'কে, গুপী লাকিন?'

'হ্যা।'

'ভেতরে আয়।'

গুপী ঘরের মধ্যে চলে এল। বসতে বসতে বলল, 'হাট ঠেঙে সিদে তোর এখেনে চলে এয়েচি। তোর সন্‌গে এট্টা কথা—'

'কথা পরে হবে। হাট ঠেঙে এইচিস। লিচ্চয়, খিদে পেয়েচে।' বলেই বাইরের দিকে তাকাল গগন। জোরে জোরে ডাকতে লাগল, 'টিয়া—টিয়া—'

টিয়া অর্থাৎ গগনের বউ রান্নাঘরে ছিল। ডাক শুনেই ছুটে এল।

কত বয়স হবে টিয়ার? বড়জোর কুড়ি কি একুশ। গায়ের রঙ কালো। নাকটা বোঁচা, চোখদুটো ভাসা-ভাসা, গালদুটো ফুলো। সব মিলিয়ে টিয়ার মুখখানা ভারি সরল আর অকপট। সবচেয়ে আশ্চর্য তার হাসিটি। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সবসময় সেটি লেগেই আছে। মনে হয় হাত-পা বা অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মত হাসিটি তার জন্মসূত্রে পাওয়া।

টিয়া বলল, 'ডাকলে কেনে?'

'ছ্যাখ্, কে এয়েচে—' গগন বলল।

গুপীর দিকে তাকিয়ে টিয়া বলে উঠল, 'ওমা, তুমি কতোক্ষণ গো!

'এইমাত্তর—'গুপী বলল।

গগন বলল, 'সিদে হাট ঠেঙে এয়েচে! ওকে কিছু খেতে দে।'

ঘরেই মুড়ি ছিল। বেতের ডালা ভর্তি করে গুপীকে দিল টিয়া। তারপর রান্নাঘরে চলে গেল।

খেতে খেতে গুপী বলল, 'ভারি বিপদে পড়েচি ভাই—'

'বিপদ!' একটু অবাক হল গগন।

'হ্যা।' গুপী বলতে লাগল, 'ভামিকে বে' করবার জন্যে মুরুব্বি বড্ড পেছু নেগেচে। আজকের হাটেও ধরে ছেল—'

'পেছু য্যাখন নেগেচে, বে' করে ফ্যাল্।'

'কিন্তুক—'

'কী?'

একটু ইতস্তত: করল গুপী। তারপর বলল, 'তুই তো সবই জানিস গগোন।'

'কী জানি ?'

'ওই নিশিব ব্যাপাবটা। ওব জন্যে—'বলতে বলতে গুপী থামল। নিশিব সব কথাই এর আগে গগনকে বলেছে সে।

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল গগন। জোবে জোরে ডাকল ' টিয়া-টিয়া—'

ছুটতে ছুটতে টিয়া এল। বলল, 'বাব বাব ডাকচ কেনে ?'

'মজার কতা আচে।' গগন বলল।

'এ্যাখন মজাব কতা শোনাব সোময লেই। কড়ায তরকারি চাপিযে এইচি। পুড়ে যাচ্ছে।'

'যাক গে। তুই ইদিকে এসে বোস দিকি।' টিযাব হাত ধবে টেনে বসিযে দিল গগন।

'যা কইবাব তাডাতাড়ি কযে ফ্যাল।'

'জানিস তো, ভামিকে বে' কববে বলে অনেকদিন ধবে গুপী মুরুব্বিকে কথা দিযে বেখেচে ?'

'জানি।'

'এ্যাখন কিন্তুক ও ভামিকে বিযে করতে চাইচে না।'

'ও মা, কেন ?' টিয়া শুধলো।

গগন বলল, 'যুগেনেব ওই বেধবা বউটা যাব নাম নিশি ; তার জন্যে ওব পেবাণে আকপাঁকু জেগেচে। তাই—'

টিযা আব কিছু বলল না। ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

একটু চুপ।

মুখ নীচু করে বসে আছে গুপী। নখ খুঁটছে। তাকে আস্তে একটা ঠেলা দিযে গগন ডাকল 'এ্যাই গুপী—'

'বল—' গুপী মুখ তুলল না।

'লিজেব মনেব কতা তো জানিস, নিশির মনেব খপবটা পেইচিস তো ? সে কী চায়, তোব পিতি তার কতখানি টান—'

'কি জানি, ঠিক করে কিচ্চু বুঝি না। মেইয়েছেলেটা ক্যামন যেন আলো-আঁধারির মতন!'

'আগে তার মনটা জান। যদি বুজিস তোর দিকে টান আচে, তাকে নিয়ে কুথাও চলে যা। এখেনে থাকলে নিশিকে তুই পাবি নি। মুরুব্বিই তোকে পেতে দেবে নি।'

'না-না, আমার দিকে তার টান আচে জানলেও তাকে লিয়ে পালাতে পারব নি। আমার বড্ড ডর লাগে।' ভীরু গলায় গুপী বলল।

গগন বলল, 'অত ভীতু হলে কখনো চলে—'

ও-পাশ থেকে টিয়া বলে উঠল, 'না, তুমার মতন ডাকাত হবে!'

টিয়ার কথাটার পেছনে একটা ঘটনার ইঙ্গিত আছে।

বছরখানেক আগে দ্বারিকনগরে গানের বায়না নিয়ে গিয়েছিল গগন। সেখানকারই মেয়ে টিয়া। গগনের গান শুনে টিয়ার মন মজেছিল। টিয়াকে দেখে গগনের ও কেন জানি ভাল লেগে গিয়েছিল। পরস্পরের মন জানাজানি হতে বেশি দেরি হয় নি। কিন্তু মন চাইলেই তো সব সময় মনের মানুষ মেলে না। সমাজ আছে, সংসারে হাজারটা বাধা আছে।

গগন আর টিয়ার জাত আলাদা। গগন জানত, স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে কিছুতেই গ্রাহ্য হবে না। তাই এক দিন রাত্রে টিয়াকে নিয়ে সোজা নয়া বসতে পালিয়ে এসেছিল। গুপী বলল, ডাকাত না হলে সোমসারে কিচুই পাওয়া যায় না।'

টিয়া বলল, 'বুঝলম। কিন্তুক সবাই তো তা হতে পারে না।'

আর একপাশে বসে গুপী ভাবল, গগন এবং টিয়া দুজনেই ঠিক কথা বলেছে। ডাকাত না হলে পৃথিবীতে নিজের প্রাপ্য আদায় করা সম্ভব না। কিন্তু ক'জনই বা তা হতে পারে! অন্তত গুপী তো নয়ই। নিশিকে লুঠ করে নিয়ে যাবার সাহস তার নেই।

ষোল

পরের দিনের কথা।

এইমাত্র হাটটা ভেঙে গেল।

সন্ধ্যে হয়-হয়। দূরের আকাশটাকে এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। সামনের নদীটাও আবছা হয়ে গেছে।

খানিকটা আগেও সামান্য আলো ছিল। এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। চারপাশ কেমন যেন মৃত, স্তিমিত, বিষণ্ণ।

নয়া বসত থেকে যারা এসেছিল তাদের সবাই মাছমারা। আজকার মত তাদের বেচাকেনা শেষ হল। মাছের চাঙাড়িগুলো নদীর জলে ধুয়ে নিল তারা। এবার ঘরে ফেরার পালা।

কুবের বলল, 'তোরা বাড়ি যা। আমি এট্টু পরে যাব।'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল নটবর। সে বলল, 'পরে কেনে, আমাদের সনগেই চল।'

'না। তোদের সন্‌গে যাওয়া হবে নি।'

'কেনে, এখেনে কিচু দবকার আচে?'

'হ্যাঁ।'

'কী দরকার?'

'একবার ভূষোণদার কাচে যেতে হবে।'

ভূষণের নাম করতেই সবার মুখেচোখে সন্ত্রাসের ছায়া খেলে গেল। কুঞ্জ, বিলাস, গুপী, নটবর—সবাই কেমন যেন চকিত হয়ে উঠল। হবার কারণও আছে।

পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে আর সবই তারা পেয়েছে, পায় নি শুধু মাটির উত্তরাধিকার। তারা নির্ভূম। কাছেই যেখানে পতিত জমি দেখেছে সেখানেই বসত গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই বসতের আয়ু আর ক'দিন? দু-মাস, চার মাস, জোর একবছর। তারপরই এক-

দিন দেখা গেছে, পতিত জমিটার একজন মালিক আছে। সেই মালিক তাদের উৎখাত করে দিয়েছে।

পৃথিবীর কোন মাটিই বেওয়ারিশ নয়। ফলে যতবার তারা বসত করেছে, ততবারই একজন করে মালিক বেরিয়ে পড়েছে। আর সেই মালিকদের খবর প্রথম যার মারফত পাওয়া গেছে, সে ভূষণ!

প্রতিবারই ভূষণ খবর দিয়েছে, 'এ জায়গাটার এট্টা মালিক বেইরে পড়ল গো। অত কষ্টো করে ঘরদোর তুললে; সব ফেলে যেতে হবে। বরাবরই দেখচি, তোমাদের অদেষ্টটা ভারি খারাপ।'

ভূষণ নামে সেই লোকটা অমোঘ নিয়তির মত। সে খবর দেবার ক'দিন পরেই মালিকের লোক টাঙি-বল্লম নিয়ে হানা দিয়েছে।

বাঘের আগে যেমন ফেউ ডাকে তেমনি তাদের উৎখাত হবার আগে খবর আনে ভূষণ।

সেই ভূষণের সঙ্গে কুবের মুরুব্বি আজ দেখা করতে যাচ্ছে। কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি-না, কে বলবে।

নয়া বসতের মাছমারারা ভীত এবং উৎকণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে. সবার হয়ে নটবর শুধলো, 'ভূষোণদার কাচে যাচ্চ যে?'

কুবের বলল, 'সে ডেকে পাটিয়েচে।'

'কেনে, কিচু খপর আচে?'

'কেমন করে কইব, আগে তার সনগে দেখা করি। তা'পর তো বুজতে পারব, খপর আচে কি লেই।'

একটু চুপ।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে কুঞ্জ বলে উঠল, 'লিচ্চয় খপর আচে৷ লইলে ডেকে পাটাবে কেনে?'

কুবের মাথা নাড়ল। বলল, 'তাই তো মনে হচ্চে।'

'আমার মনটা কিন্তুক বড্ড কু গাইচে মুরুব্বি।'

'কু গাইচে?'

'হ্যা।' কুঞ্জ বলতে লাগল, 'মন গাইচে, ভূষোণদার কাচ ঠেঙে আজ তুমি এট্টা খারাপ খপর পাবে।'

'খপরটা যে খারাপই হবে, এ্যামন কতা ভাবচিস কেনে? ভালোও তো হতে পারে।'

কুঞ্জ বিড় বিড় করে উঠল, 'ভাল লয়, কিচুতেই ভাল লয়। ভূষোণদার খপর কক্ষনো ভাল হতে পারে না।' একটু থেমে কি ভেবে আবার বলল, 'বড্ড ডর লাগচে মুরুব্বি।'

কুবের বলল, 'ভূষোণদা কেনে ডেকেচে, তার কিচুই জানলম নি। আগেই তুই ডরিয়ে মরচিস! শুদু শুদু অমন ডরাস নি তো।'

কুঞ্জ জবাব দিল না।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নদীর ঘাট থেকে শেষ বোটটিও চলে গেছে। হাটের চালায় নয়া বসতের ক'জন মাছমারা ছাড়া আর কেউ নেই।

মাছের বাজারের এক পাশে একটা ঘোড়ানিমের গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথা থেকে একটা প্যাঁচা কর্কশ গলায় ডেকে উঠল।

এতক্ষণ কথা বলতে বলতে হুঁশ ছিল না। প্যাঁচার ডাকে হঠাৎ সচেতন হয়ে গেল কুবের। বলল, 'ঢের রাত হয়েচে। তোরা এ্যাখন বাড়ি যা। ডরের কিচু লেই।'

কবের বলল বটে ভয়ের কিছু নেই কিন্তু কেউ ভরসা পেল না। কুঞ্জদের মুখচোখ দেখে মনে হল, ভেতরে ভেতরে তারা তটস্থ হয়ে আছে। হবারই কথা। তাবা সাধারণ মানুষ। বার বার তাদের বসত ভেঙেছে ফলে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঘরপোড়া গরুর মত। সিঁদুরে মেঘ দেখেই তাদের ভয় হয়; একটুতেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

কুঞ্জ বলে উঠল, 'আমরা তুমার সন্‌গে ভূষোণদার কাচে যাব?'

ভূষণের মুখ থেকে খবরটা না শোনা পর্যন্ত তাদের ভয়, সংশয়—কিছুই ঘুচছে না।

কুবের বলল, 'এ্যাত লোক গে দরকার লেই। তোরা বরঞ্চ ফিরে যা। সব শুনে আজ রাত্তিরেই তুদের খপর দোব।'

'তুমি য্যাখন কইচ, ফিরেই যাচ্চি।'

অনিচ্ছাসত্বেও কুঞ্জরা নয়া বসতের দিকে রওনা হল। অন্য অন্য দিন তামাশা করতে করতে পথ চলে। কাঁকা বাদার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কেউ বা বেসুরো গলায় গান জুড়ে দেয়। হাসিতে-তামাশায়-গানে সারাটা পথ তারা মেতে থাকে। কিন্তু আজ মাতামাতি তো নেই-ই, কেউ একটা কথা পর্যন্ত বলছে না। সবাই কেমন যেন স্তিমিত, ম্রিয়মান।

কুঞ্জরা চলে গেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কুবের। তারপর মাছের বাজার পেছনে ফেলে ঘোড়ানিমের গাছটাকে বাঁয়ে রেখে সোজা উত্তরদিকে হাঁটতে শুরু করল।

দু-পাশে সারবন্দি হাটের চালা। মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। চলতে চলতে একটু আগের কথাগুলো ভাবতে লাগল কুবের। কুঞ্জদের সে অভয় দিয়ে এসেছে বটে, নিজের মনেই কিন্তু তেমন জোর পাচ্ছে না। হঠাৎ কেন যে ভূষণ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, কে বলবে।

জগত এবং জীবন সম্বন্ধে কুবেরের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা। অনেক দেখেছে সে, অনেক জেনেছে। তাই হাজার বিপদেও সে অভিভূত হয়ে পড়ে না। যত সমস্যাই আসুক, কুবের ধীর স্থির এবং শান্ত।

তবু ভূষণ ডেকে পাঠাতে সে বিচলিত হয়েছে। কুঞ্জদের কাছে অবশ্য অস্থিরতা দেখায় নি। কিন্তু এখন যত এগুচ্ছে সংশয় এবং দুশ্চিন্তায় তার মনের ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

কুঞ্জর মনের কু-ডাকটা যদি সত্যি হয় (সে সম্ভাবনাই বেশি) এবং যদি আবার তাদের উচ্ছেদ হতে হয় তা হলে খুবই ভাবনার কথা। ভয়ের কথাও। কেননা, সমুদ্রের মুখ থেকে উৎখাত হলে এবার তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

দুর্ভাবনায় চোখদুটো কুঁচকে গেল কুবেরের। কপালে কতকগুলো রেখা ফুটে বেরুল। রেখাগুলো এত গভীর, মনে হয় কেউ বসিয়ে বসিয়ে দাগ কেটেছে।

একসময় পায়ের তলার পথটা ফুরিয়ে গেল।

হাটের শেষ মাথায়, একটেরে একখানা ঘর। ঘর বললে সঠিক বলা হয় না। দোকান বলাই উচিত ; মুদির দোকান। তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল কুবের।

দোকানঘরটা হাটের চালাগুলো থেকে খানিকটা দূরে। একটু যেন পৃথক এবং নিঃসঙ্গ। হাটের মধ্যে থেকেও যেন সে নেই।

বিশ বছর ধরে পাতিবুনিয়ার হাটে আসছে কুবের। প্রথম দিন যেমন দেখেছিল, আজও তেমনই দেখছে। তেমনই চারটে দুর্বল পায়ে ভর দিয়ে পেছন দিকে বিপজ্জনকভাবে অনেকখানি হেলে দোকান ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় গোলপাতার ছাউনি, চার-পাশে মাটির বেড়া—সবকিছু সেই প্রথম দেখার মতই আছে। একটা দুটো দিন না, বিশ বিশটা বছর। এতকালের মধ্যে দোকান-ঘরটা বিন্দুমাত্র বদলায় নি।

বাইরে থেকেই কুবের দেখতে পেল, ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। লাল রঙের খেরো খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে একটা লোক কি যেন লিখছে। লোকটার বয়স আন্দাজ ষাট। গায়ের রঙ তামাটে। মাথাটা ধবধবে সাদা। দাঁড়ালে খুব একটা লম্বা দেখাবে না তাকে। খুব বেঁটেও না। সাধারণ হাটুরে মানুষ যেমন হয়, লোকটা অবিকল তাই। তার চেহারার কোথাও কোন চমৎকারিত্ব নেই।

দেখেই চিনতে পারল কুবের। লোকটা ভূষণ ; এই মুদি-দোকান তারই।

কী লিখছে ভূষণ ? হিসেব-টিসেব হয়ত।

কুবের একটু ইতস্তত করল। তারপর ডাকল, 'ভূষোণদা—'

খুব নিবিষ্ট হয়ে ভূষণ লিখছিল। নিজের নামটা কানে যেতেই চমকে উঠল। বলল, 'কে ?'

'আমি কুবির।'

'কুবির ! আমি ভাবলম, কে না কে।' আস্তে আস্তে ভুষণের

চমকটা থিতিয়ে গেল। সে বলল, 'তা বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেনে? ভেতরে আয়।' বলেই আবার লিখতে শুরু করল।

কুবের ভেতরে এসে বসল।

বাইরেটাই শুধু না, দোকানঘরের ভেতরটাও হুবহু একই রকম আছে। বিশ বছর আগেও যা, আজও তাই। সামান্য কিছু চাল-ডাল-তেল-নুন আর বেনেতি মশলা নিয়ে এখানে দোকানদারি আরম্ভ করেছিল ভূষণ। আজও তাই করে যাচ্ছে। চাল-ডাল্-তেল-মশলার বাইরে আর কিছুই তার কাছে পাওয়া যাবে না। যে সব সওদা তার দোকানে আছে সেগুলোও যদি কেউ বেশি পরিমাণে চায়, হতাশ হতে হবে। কেননা, ভূষণের আয়োজন খুবই অল্প। তার পরে এসে কত লোক পাতিবুনিয়াতে দোকান খুলল। রাতারাতি সে সব দোকান ছোট থেকে বড় হল। বড় থেকে আরো বড়। কিন্তু ভূষণের ব্যবসা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। ব্যবসা বাড়াতে হলে যে উদ্যম এবং আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন, ভূষণের তা নেই।

অনেকেই বলে, 'কারবারটা এট্টু বড় কর ভূষোণদা। মাল-পত্তর বেশি বেশি করে রেখে দোকানটাকে সাজিয়ে ফ্যাল।'
উদাসীন গলায় ভূষণ জবাব দেয়, 'কী দরকার, এই বেশ চলছে।'

এই ছোট্ট দোকান ঘরে ভূষণের মনোভাবটা যেন প্রতিফলিত। তার যা আছে এবং যতটুকু আছে তাতেই সে সুখী। এর চেয়ে বেশি কিছু সে চায় না। তেমন লোভও তার নেই।

এই মুহূর্তে ভূষণের ব্যবসার কথা ভাবছে না কুবের। সে জন্য তার দুশ্চিন্তাও নেই। ভূষণ কেন যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, তাই ভেবে ভেবে এখন সে অস্থির।

এদিকে হিসেবের খাতায় ঝুঁকে ভূষণ লিখছে তো লিখছেই। কোনদিকে তার হুঁশ নেই।

আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল কুবের। যখন দেখল, ভুলেও ভূষণ তার দিকে তাকাচ্ছে না তখন বলল, 'ভূষোণদা, তুমি আমায় ডেকে পাটিয়েছিলে —

'হ্যা' লিখতে লিখতেই ভূষণ বলল, 'না ডাকলে তোরা কখনো আসিস! বেঁচে আচি কি মরে গেচি, একবারও এসে খোঁজ লিস!'

ভূষণ অনুযোগ করল বটে, কিন্তু নিতান্ত অন্যাযভাবে এবং অকারণে! ডেকে পাঠালেও কুবের আসে, না ডাকলেও আসে। অবশ্য কাজকর্ম এবং নানান ঝামেলার জন্য এবার অনেকদিন সে আসতে পারে নি।

ভূষণের কথায় খুবই আঘাত পেয়েছে কুবের। ক্ষুব্ধ গলায় সে বলল, 'ক'দিন আসি নি, তাই অমন কথা কইচ ভূষোণদা! লইলে এর আগে রোজ তুমার কাচে আসি নি? তুমার খপর লিয়ে যাই নি? বল, লিজের বুকে হাত দে বল।'

'গুসা হোস নি কুবির। অনেকদিন তোকে দেখিনি, তাই অমন কথা কোযেচি।' ভূষণ বলল। বলেই আবার হিসেবের মধ্যে তলিয়ে গেল।

নিজের মনেই কুবের বলতে লাগল, 'দু দিন না আসতে পাবি, দশ দিন না আসতে পাবি কিন্তুক তুমার কাচে আসতে আমাদের হয়ই। ডাকলেও আসতে হয়, না ডাকলেও আসতে হয়। তুমার খপর না রেখে উপায় আচে!'

কথাটা ঠিকই বলেছে কুবের। ভূষণের কাছে তাকে আসতেই হয়। শুধু তাকেই না, আবাদ অঞ্চলের তাবত মানুষকেই। ভূষণের কাছে না এলে কারো চলে না।

কেন সবাই তার কাছে আসে? এই প্রশ্নটার জবাব পেতে হলে ভূষণের চরিত্রটাকে গভীরভাবে বুঝতে হবে।

দোকানদার হিসেবে সে খুবই ক্ষুদ্র, খুবই সীমাবদ্ধ। নিজের ব্যবসা সম্বন্ধে তার চরম উদাসীনতা। কিন্তু আর একটা দিক আছে যেখানে তার প্রচুর উৎসাহ, যেখানে তার জীবন বিস্তৃত এবং সীমাহীন। সেটা কোন দিক? সেটা ভূষণের সঞ্চয়ের দিক। অর্থ নয় বিত্ত নয়, দিবারাত্রি রাশি রাশি তথ্য জমা করে চলেছে সে।

আবাদ অঞ্চলের সমস্ত খবর তার জানা। কোন জমিদার কোথায় নতুন জমি কিনল, কোন ভেড়িওয়ালা কোন জায়গাটা ইজারা

নিল, কোথায় নোনা জল ঢুকে গর্ভিণী মাটিকে একেবারে বন্ধ্যা করে গেছে, সব—সব খবর সে রাখে। তার জীবনে তত্ত্ব খুব বেশি নেই, শুধুই তথ্য। অসংখ্য অজস্র তথ্য। দোকানঘরে বসে সব সময় সব খবর পাওয়া যায় না। তাই প্রায়ই দোকান বন্ধ করে সে বেরিয়ে পড়ে, এমনই তার উদ্যম।

যার কাছে এত তথ্য এত খবর, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার সঙ্গে সবাইকে যোগাযোগ রাখতেই হয়। কখন কোন খবরটা দরকারে লেগে যাবে কে বলতে পারে।

কেউ যদি শুধোয়, এই সব খবর জোগাড় করে তার কী লাভ.. ভূষণ জবাব দেয় না। মনে মনে শুধু বলে, 'লাভটা যে কী, তোরা বুঝবি নি।' ঠিকই বলে সে। কেননা তার লাভ-লোকসানের বিচারটা আর দশজনের থেকে আলাদা। সেটা বুঝতে হলে এই আবাদ অঞ্চলটাকে খুব ভাল করে জানতে হবে। এখানকার মাটিতে অনেক জটিলতা। সাধারণ মানুষ কেউ হয়ত ভুল করে ভেড়িবাবুদের জায়গায় মাছ ধরে বসল, অমনি তাকে বিপাকে পড়তে হল। কেউ হয়ত না জেনে জমিদারের জায়গায় ঘর তুলল, ফলে জমিদারও তার প্রাণান্ত অবস্থা করে ছাড়ল। কেউ হয়ত এমন জমিই কিনল, যার শরিক সাতজন। একজনের কাছ থেকে সে কিনেছে, বাকী ছ'জন মামলা ঠুকে দিল।

আগে ভাগে সমস্ত খবর জোগাড় করে রাখে বলে সবাইকে সাবধান করে দিতে পারে ভূষণ। এতে তাদের যথেষ্ট উপকার হয়; ভুল করে বা না জেনে অহেতুক ঝামেলায় পড়তে হয় না।

সামান্য একটু খবর দিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট থেকে সবাইকে যে সে বাঁচাতে পারে, এতেই ভূষণের আনন্দ, তৃপ্তি। টাকা নয় পয়সা নয়, এই তৃপ্তি আর আনন্দটুকুই তার পরম লাভ।

এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার আলাপ। শুধু আলাপই নয়, গভীর ঘনিষ্ঠতাও। তাদের যাবতীয় সুখদুঃখের অংশীদার সে। তাদের ভালমন্দের সব দায় যেন তার। কেউ যাতে হঠাৎ কোন

সে। এই-ই তার জীবন, তার চরিত্র।

ব্যবসার মধ্যে পারে নি, কিন্তু আবাদের মানুষগুলোর মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে ভূষণ।

একটু একটু করে অনেকখানি রাত হয়েছে। কুবের বসে আছে তো বসেই আছে। আর ঘাড় গুঁজে ভূষণ লিখেই চলেছে। এত কি লিখছে সে! তার ছোট্ট মুদি দোকানে কত হিসেব থাকতে পারে!

বসে থাকতে থাকতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল কুবের, 'ভূষোণদা, ঢের রাত হ'ল। এবেরে—'

কুবেরের কথা শেষ হবার আগেই ভূষণ বলল, 'আর এট্টু বোস্। এই হয়ে এল।'

কুবের গজগজ করতে লাগল, 'কতোক্ষণ বসে আচি। তুমার সনগে কতা সেরে তিন কোশ ঠেঙিয়ে ঘরে যেতে হবে। যেতে যেতে রাত পুইয়ে যাবে।'

ভূষণ জবাব দিল না।

আরো খানিকটা সময় কেটে গেল।

একসময় হিসেব লেখা শেষ হল। লাল রঙের খেরো খাতাটা বন্ধ করে ভূষণ কুবেরের দিকে তাকাল। বলল, 'কেন, তোকে ডেকেপাটিয়িচি, জানিস?'

কুবের যেন চমকে উঠল। ভূষণের কাছ থেকে কী শুনতে হবে, কে জানে। শ্বাসরুদ্ধ গলায় সে শুধলো, 'কেন?'

'এট্টা কতা আচে।'

এবার কুবেরের উদ্বেগ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল। কুঞ্জ তাকে যে প্রশ্নটা করেছিল, এই মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে সেটাই বেরিয়ে এল, 'কী কতা? খারাপ কিছু?'

'আমি বুঝি তোদের খারাপ কতাই কই?' ভূষণের স্বরে ক্ষোভ ফুটে বেরুল।

'না, তা লয়। তবে—'

একটা ঢোক গিলল কুবের। বলল, 'বেপদ' (বিপদ) আপদের খপর থাকলে তুমি ডেকে পাটাও কি-না। তাই ভেবেছিলম—' বলেই সে চুপ করল।

ভূষণ বলল, 'ভেবেছিলি আজও তুদের এট্টা ঝঞ্চাটের খপর দোব ; তাই লয় ?'

খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল কুবের। মুখ নামিয়ে অস্ফুট গলায় বলল, 'হ্যা।'

এবাব ভূষণ কাছে এগিয়ে এল। খুব অন্তরঙ্গভাবে কুবেরের পিঠে একখানা হাত রেখে বলল, 'আজ যে কতাটা কইব, সেটা খারাপ লয়। তুদের কুনো ডর লেই।'

'ডর লেই !' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুবের।

'না।'

'বাঁচালে ভূষোণদা।' কুবের বলতে লাগল, 'তুমার লোক গে য্যাখন কইল, আমায় তুমি ডেকে পাটিয়েচ, ভয়ে বুকেব ভেতর কাঁপুনি ধবে গেছল। ভেবেছিলম, না জানি তুমার কাচে এসে কি শুনতে হবে। কিন্তুক এ্যাখন আব ভাবনা লেই।'

কুবেরের উদ্বেগ ঘুচেছে। দমবন্ধ সন্ত্রস্ত ভাবটা কেটে গেছে। ভূষণ বলেছে, ভয় নেই। মাত্র এটুকু জেনেই সে আশ্বস্ত।

খানিকটা চুপচাপ।

তারপর কুবেরই আবার শুরু করল, 'তা হলে বল, কী জন্যে ডেকে পাটিয়েছেলে—'

ভূষণ বলল, 'গেঁওখালির নাম শুনিচিস্ ?'

'শুনিচি। লদীব উপারে, মিদিনীপুর জেলার এট্টা গেবাম তো!'

'হ্যা।'

'হঠাৎ গেঁওখালির কথা কইচ যে—'

'এ বচ্চর বন্যায় সেকেনে খুব বান হয়েছে। লোকেব ঘরদোর ভেসে গেচে। লোনা জল জমিনের স'ব্বানাশ করে দিয়েচে।'

ভূষণ কী [illegible] চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল কুবের।

ভূষণ বলতে লাগল, 'সেকেন ঠেঙে ক'জন লোক আমার কাচে এয়েচে।'

'কেনে?' এবার মুখ খুলল কুবের।

'মাটির খোঁজে। ইদিকে যদি এট্টু জায়গা পায়, তারা বসত করবে।'

'অ।'

ভূষণ বলতে লাগল, 'তা অনেক খুঁজলম কিন্তুক সুবিদে মতন জায়গা কুথাও পেলম নি। তাই শেষঅব্দি (অবধি) তোকে ডেকে পাটিয়িচি।'

'আমি কী করব?' কুবের শুধলো।

নিজের মনে কি একটু ভেবে নিল ভূষণ। তারপর বলল, 'তুদের লয়া বসতে তো অনেক জায়গা। গেঁওখালির লোকগুলোনকে থাকার মতন এট্টু ব্যাওস্থা করে দে না।'

'বেশ তো। জমিন পড়ে আচে। তারা গে ঘরদোর তুলে লিক।'

'তা হলে ওদের পাটিয়ে দোব?'

'দিও।'

'কথা রইল কিন্তুক।'

'আচ্ছা।'

এরপর ভূষণের কাছ থেকে বিদায় নিল কুবের।

কুবের যখন ফিরে এল, তখন মাঝরাত। নয়া বসতের একটা প্রাণীও ঘুমোয় নি। তারই জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

কুবের ফেরামাত্র তারা ঘিরে ধরল। সবার হয়ে কুঞ্জ শুধলো, 'কী ব্যাপার, ভূষোণদা তুমায় ডাকিয়েছেল কেনে?'

ভূষণের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, আগাগোড়া সমস্ত বলল কুবের। সব শুনে কুঞ্জদের ভয় কাটল।

সতের

এতদিনে নিশির সময় হল।

গুপীর ডেরায় এসে ভাঁটুনীকে দেখে যাবার ইচ্ছেটা অবশ্য তার বরাবরই ছিল। একবার আসার উদ্যোগও করেছিল নিশি। কিন্তু নটবরের জন্য আসা হয় নি। তারপর নানা কাজে জড়িয়ে গেল সে। নয়া বসতের মাছমারাদের ছেঁড়াখোড়া এত জাল এসে পড়ল যে মেরামত করতে করতে আসার মত ফুরসতই পেল না।

প্রায় পনের দিন হল, ভাঁটুনী এসেছে। যত কাজই থাক, এর মধ্যে একবারও কি তাকে দেখে আসতে পারত না নিশি ? পারত বৈকি! তবু কেন সে যায় নি ? যায় নি তার কারণ আছে। কারণটা হল, তার মনের লীলা। নিশি দেখছিল সে না যাওয়াতে গুপী কতখানি অস্থির হয়।

রোজই গুপী আসে। রোজই তাকে যাওয়ার কথা বলে যায়। নিশি মুখে বলে যাবে, কিন্তু যায় আর না।

আজ সকালেও গুপী এসেছিল। বলেছিল, 'পিত্তিজ্ঞে করলে লাকি গো মেইয়েছেলে ?'

'কিসের পিতিজ্ঞে ?' নিশি শুধিয়েছিল।

'আমার বাড়ি না যাওয়ার।'

'তুমার বাড়ি যাব নি, এ্যামন কথা কখনো কোয়েচি !'

'কইতে হবে কেনে ? কাজেই তো বুজিয়ে দিচ্চ।' ক্ষুব্ধ গলায় গুপী বলে যাচ্ছিল, 'তুমায় না জানিয়ে ভাঁটুনী বুড়ীকে ঠাঁই দিইচি। তার জন্যে তো এক শো বার দোষ মেনিচি। তভু তুমি আমায় এ্যামন করে শাস্তি দিচ্চ !'

'শাস্তির কথা লয় ব্যাটাছেলে।' নিশি বলেছিল, 'সোময় পাই না, কাজকম্মের বড্ডো ঝামেলা ; তাই যাওয়া হচ্ছে না। ভেবো নি,

এট্টু ফাক পেলেই যাব। কী 'অত্ন' (রত্ন) ঘরে এনে তুলেচ, দেখে আসব।'

'যাবারও দরকার লেই; দেখারও দরকার লেই।' বলেই আর দাঁড়ায় নি কুবের। হন হন করে চলে গিয়েছিল।

আর নিশির ঠোঁটে চিরকালের সেই রহস্যময় হাসিটা ফুটে বেরিয়েছিল। মনে মনে সে ভেবেছিল, আর না, গুপীকে নিয়ে অনেক খেলা হয়েছে। এবার তার ডেরায় যেতে হবে।

এখন দুপুর।

আকাশটা কেমন যেন মেঘলা মত। সমুদ্রর দিক থেকে হাওয়া দিয়েছে ; এলোমেলো উদাস হাওয়া। যদিও অঘ্রাণ মাস, আজকের দিনটিতে শরৎকালের আমেজ পুরোপুরি ধরা দিয়েছে।

আকাশের দিকে একবার তাকাল নিশি। তারপর সাজতে বসল। চোখের কোণে সরু করে কাজলের টান দিল। পান খেয়ে ঠোঁট দুটোকে টুকটুকে করল। যদিও বিধবা, বাহার করে এমন একখানা শাড়ি পরল যার রঙ ডগডগে লাল। কাঠের চিরুণি আর সস্তা দামের একখানা আয়না কাছেই পড়েছিল। চিরুণি দিয়ে আঁচড়ে চুলগুলো মস্ত একটা খোঁপার মধ্যে সংযত করল নিশি। তারপর আয়নাটা মুখের সামনে ধরল। আয়নাতে যার ছায়া পড়েছে ফিস ফিস করে তাকে শুধলো, 'ক্যামন দেখাচ্চে লো, ডাইনীর মতন না লাগরীর মতন?' উত্তর মিলল না।

মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইল নিশি। কেমন যেন ঘোর লেগে গেল তার।

ঘোর কাটলে একসময় সে উঠে পড়ল। তারপর ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে গুপীর ডেরায় রওনা হ'ল।

উঁচু টিবির ওপর তার ঘর। সেখান থেকে নীচে নামল নিশি। ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকে তাকাল না। বরাবর উত্তরদিকে হাঁটতে লাগল।

গুপীর ডেরায় এসে নিশি যখন পৌছল।. বেলা তখন হেলে পড়েছে। সূর্যটা পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে।

দূর থেকেই নিশি দেখতে পেল, উঠোনের একধারে একটা বুড়ী অর্থাৎ ভাঁটুনী, রান্না করছে। তার মন বলল, এই সে-ই।

একটুক্ষণ ভাঁটুনীকে দেখল নিশি। তারপর আস্তে আস্তে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধলো, 'তুমিই বুঝিন লোতুন মানুষ?'

রান্নায় বিভোর হয়ে ছিল ভাঁটুনী। চমকে ঘুরে বসল।

নিশি আবার বলল, 'গুপী বুঝিন তুমাকেই আশ্রয় দিয়েচে?'

ভাঁটুনী জবাব দিল না। বিস্মিত, অবাক চোখে নিশির দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় পনের দিন হ'ল, সে এখানে এসেছে। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটাকে এর আগে সে কখনও দেখে নি। অথচ কি আশ্চর্য, মেয়েটা তাব খোঁজ খবর রেখেছে। অন্তত তার কথা শুনে তাই মনে হয়।

দু-দুবার প্রশ্ন করেছে কিন্তু একবারও উত্তর পায় নি। ফলে একটু যেন বিরক্তই হ'ল নিশি। বলল, 'বোবা নাকিন গো?'

এতক্ষণে মুখ খুলল ভাঁটুনী। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন দুঃখুতে বোবা হতে যাব লো?'

'বোবা য্যাখন লও, মুখ বুঁজে আচো কেনে? কতার জবাব দাও।'

'দাঁড়া ছুঁড়ি, জবাব দেবার আগে তোকে এট্টু দেখি।'

'দ্যাখো।'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ নিশি বলে উঠল, 'দেখা হ'ল?'

'হয়েচে।' ঘাড় কাত করল ভাঁটুনী। বলল, 'এবেরে তোব কথার জবাব শোন্—'

'বলো।'

'ঠিক ধরিচিস আমি লোতুন মানুষ, গুপী আমায় আশ্রয় দিয়েচে।' বলেই পাল্টা একটা প্রশ্ন করল ভাঁটুনী, 'কিন্তন তুই কে? তোকে তো চিনতে পারলম নি।'

'আমি নিশি।'

'নাম তো বুঝলম নিশি। কিন্তুক ঘর কুথায় তোর? কাদেব মেইয়ে তুই?' নিশির যাবতীয় পরিচয় জেনে নিতে চাইছে ভাঁটুনী।

নিশি বলল, 'অত তাড়া কিসের! সবে এয়েচ, দু দিন সবুর কর না। তা'পর আমি কে, কুথায় থাকি, আস্তে আস্তে সব জানতে পাববে। এ্যাখন নামটা জেনেই খুশী থাকো।'

আব কিছু বলল না ভাঁটুনী। একদৃষ্টে নিশিব দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ চুপ।

এদিকে সূর্যটা আরো ঢলে পড়েছে। যে বিষণ্ণ আলোটকু আকাশে আটকে আছে তাব তাপ নেই। পাখিবা ক্লান্ত ডানায ঘবে ফিবে যাচ্ছে। একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে, এখন চারপাশে তাবই আযোজন চলছে।

হঠাৎ একসময় নিশি শুরু কবল, 'গুপী তুমায় আশ্রয় দিয়েচে, ভাল কথা। তা—'

'কী?' ভাঁটনী উন্মুখ হ'ল।

'গুপীব সোমসাবে তুমি কদ্দিন থাকবে? দু-চাব মাস না সাবা জীবন?'

'সাবা জীবন, যদ্দিন বাঁচি।' ভাঁটুনী বলল।

চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবল নিশি। তাবপব ভাঁটনীব দিকে ঈষৎ ঝুঁকে গলাটা খাদে নামিযে ফিস ফিস কবে বলল, 'কদ্দিন বাঁচবে তাব কিছু ঠিক আচে। দু বচ্ছব হতে পাবে, দশ বচ্ছব হতে পাবে। অদ্দিন থাকা তো চলবে নি।'

ভাঁটুনী চমকে উঠল। মুহূর্তে তার ইন্দ্রিয়গুলো সতর্ক হ'ল। তীক্ষ্ণ গলায সে শুধলো, 'কেন, শুনি—'

'কেন আবার। আমার ইচ্ছে লয়, তাই।'

'তোব ইচ্ছে ধুযে জল খাব। গুপীর সনগে আমাব ব্যাওস্থা হযে গেচে। সে পাকা কতা দিযেচে। যদ্দিন বাঁচি, বাখবে—'

'গুপীর সনগে ব্যাওস্থা করে লাভ হবে নি।'

'কী কইচিস ছুঁড়ি !' একটু যেন অবাকই হ'ল ভাঁটুনী।

'ঠিকই কইচি।' নিশি বলতে লাগল, 'গুপী হুতোভুতো লোক। ভাল মানুষ পেয়ে তুমি তার ঘাড়ে চেপে রইবে আর সারা জীবন সে তুমায় খাওয়াবে পরাবে, তুমার বোঝা টেনে মরবে, তা হবে নি। অন্তোত আমি য্যাখন আচি, তা হতে দোব নি।'

টেনে টেনে ভাঁটুনী বলল, 'গুপীর ওপর তোর খুব দরদ দেখচি।'

'তা এট্টু আচে।'

আচমকা একটা কথা মনে এল ভাঁটুনীর। তীক্ষ্ণ গলায় সে শুধলো, 'গুপী তোর কে ?'

নিশি থতমত খেয়ে গেল। ভাঁটুনীর প্রশ্নটা তাকে ভাবি বিব্রত করেছে। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, 'কে আবার . কেউ লয়।'

'তা হ'লে এ্যাত দরদ কেনে ?'

'কেনে যে, লিজেই কি ছাই জানি !'

একটুক্ষণ দু-জনে চুপ।

তারপর হঠাৎ ভাঁটুনী বলে উঠল, এট্টা মিছে কতা কোয়েচিস।'

'মিছে কতা !' সোজাসুজি ভাঁটুনীর মুখের দিকে তাকাল নিশি।

'হ্যা।' ভাঁটুনী বলল, 'তোর আর গুপীর ভেতর নিচ্চয কুনো সম্পক্ক আচে। তুই সেটা চেপে যাচ্চিস।'

'ভগমানের দিব্যি, কুনো সম্পক্ক লেই। সে আমাব কেউ লয়, কিচ্ছু লয়। এক্কেবারে পর। তবে—' বলতে বলতে নিশি থামল।

'তবে কী ?'

'এট্টা ব্যাপার আচে।'

'কী ব্যাপার ?'

'য্যাত পরই হোক, আমার ইচ্ছের বাইরে যাবার উপায় গুপীর লেই।' খুব আস্তে, ফিস ফিস করে নিশি বলল।

'কি রকম ?'

'রকম জানতে চাইচ ?'

'হ্যা।'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না নিশি। চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, 'এই ধর গুপী কতা দিয়েচে, য্যাদ্দিন বাঁচবে সে তুমায় পুষবে। তাই লয় ?'

'হ্যা '

'কিন্তুক আমি যদি বেঁকে বসি আজই সে তুমায় দূর করে দেবে।'

'তোর মতন এট্টা মাগীর কতায় গুপী আমায় তাড়াবে !' ভাঁটুনী ফুঁসে উঠল, 'ত্যামন ছেলেই সে লয়।'

'গুপী ক্যামন ছেলে, তুমি জান ?' নিশি শুধলো।

'লিচ্চয় জানি।' গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ভাঁটুনী বলল।

নিশি হাসল। তার হাসিতে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বলল, 'একসন্‌গে আচো তো মাত্তর পনেরটা দিন। এর মদ্দে গুপীকে, কত্তটুকুন দেখলে ! আগে তার ভেতরের সব খপর লাও তা'পর জানার বড়াই ক'রো।'

ভাঁটুনী জবাব দিল না।

একসময় সন্ধ্যে নামল।

নিশি বলল, 'সন্‌ঝে হযে গেল, আজ যাই। যদি বেঁচে থাকি আবার তুমার সন্‌গে দেখা হবে।' বলেই আর দাড়াল না সে। জোরে জোরে পা ফেলে নিজের ডেরার দিকে রওনা হ'ল।

নিশি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ বসে রইল ভাঁটুনী। এখন চারপাশ অন্ধকার। খাড়ির ধারের গেমোবনে ঝিঁঝি ডাকছে। উঠোনময় জোনাকিরা নেচে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার ও ঝিঁঝির ডাক, জোনাকিদের নাচানাচি—কোনদিকে লক্ষ্য নেই ভাঁটুনীর। এই মুহূর্তে তার ভাবনার মধ্যে বিচিত্র এক লীলা চলছে।

ভাঁটুনীর মন বলছে, যতই অস্বীকার করুক নিশি, যতই লুকোতে চাক, তার আর গুপীর ভেতর নিশ্চয়ই গূঢ়, এবং গভীর একটা সম্পর্ক আছে।

ভাঁটুনী স্থির করল, যেমন করে হোক সেই সম্পর্কটা জেনে নেবে।

হাট থেকে বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরল গুপী। সে একাই এসেছে। মধু সঙ্গে নেই।

উঠোনে পা দিয়েই গুপীকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বাড়িটা অন্ধকার নিঝুম—যেন অথৈ ঘুমে তলিয়ে আছে। অন্য অন্য দিন ঘরের দাওয়ায় একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখে ভাঁটুনী। যতক্ষণ তারা দু-ভাই হাট থেকে না ফেরে হ্যারিকেনটা জ্বলতেই থাকে। কিন্তু আজ সারা বাড়িতে আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গুপী। তারপর ডাকল, 'পিসী, পিসী কুথায় গো—'

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে ছিল ভাঁটুনী। (নিশি যাবার পর থেকে এমন ভাবেই বসে আছে সে। একবারও ওঠে নি।) গুপীর ডাক কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠল। বলল, 'এই তো—'

'অন্ধকারে বসে আচো কেনে! আলো জ্বাল।'

'জ্বালচি।'

হাতড়ে হাতড়ে হ্যারিকেন আর দেশলাই বার করল ভাঁটুনী। আলো জ্বেলে বলল, 'এ কি তুই একা যে! মধু কুথায়?'

'সে আসে নি। হাটেই রয়ে গেচে।'

'কেন রে?'

'আর বলো নি পিসী! মাতলা ঠেঙে নামকরা দল এযেচে। পাতিবনের হাটে আজ সারা রাত্তির 'যাত্‌রা' হবে। 'যাত্‌রা' শোনার ভারি শখ মধুটার। কিছুতেই তাকে আনতে পারলম নি।'

একটু চুপ।

তারপরেই ভাঁটুনী বলে উঠল, 'ঢের রাত হয়েচে। যা হাতমুখ ধুয়ে আয়।'

'যাচ্চি।' গামছা নিয়ে খাড়ির দিকে চলে গেল গুপী। ভাঁটুনী তার জন্য ভাত বাড়তে বসল।

খানিকটা পরেই ফিরে এল গুপী। তাকে খেতে দিয়ে ভাঁটুনী বলল, 'বুজলি গুপী, আজ বিকেলে এট্টা ছুঁড়ি এয়েছেল—'

ভাঁটুনীর মুখের দিকে তাকাল গুপী। বলল, 'ছুঁড়ি!'

'হ্যা।'

'কে?'

'কে, জানি না! এর আগে তাকে আর কুনোদিন দেখি নি।'

'কি জন্যে এয়েছেল?'

'তা বলে নি।'

গুপীকে এবার চিন্তিত দেখাল। ভুরু কুঁচকে কি একটু ভাবল সে। বলল, 'নাম-টাম জেনে রেখেচ?'

ঘাড় কাত করল ভাঁটুনী। বলল, 'হ্যা। শুদু নামটাই সে কোয়েচে। তা ছাড়া কুথা থেকে এয়েচে, কি দরকার—সে সব কিছুই বলে নি।'

'কী নাম তার?' গুপী শুধলো।

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল না ভাঁটুনী। গুপীর খুব কাছে এসে ঘন হয়ে বসল। তারপর ফিস ফিস করে উঠল, 'তার নাম নিশি—'

গুপী চকিত হ'ল। এতদিনে নিশি তা হলে সদয় হয়েছে! সময় করে ভাঁটুনীকে দেখে গেছে! খুশিতে গুপীর চোখদুটো চক চক করতে লাগল। সে বলল, 'নিশি এয়েছেল!' শব্দ দুটো তার বুকের গভীর থেকে যেন লাফ দিয়ে উঠে এল।

প্রায় অস্ফুট গলায় ভাঁটুনী বলল, 'হ্যা।'

গুপী আর কিছু বলল না।

ভাঁটুনী শুধলো. 'নিশি কে?'

মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে নাড়াচাড়া করছিল গুপী। বলল, 'আমার মিতের বউ।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ভাঁটুনী। তার চোখের সামনে নিশির চেহারাটা ভেসে উঠল। পরনে লাল রঙের ডগডগে শাড়ি, পানের রসে ঠোঁট দুটো টুকটুকে। কালো পালকে ঘেরা বড় বড়

চোখ, সরু ভুরু, সুঠাম গলা, চিকণ কোমর—কোথাও কোন ত্রুটি নেই। তবু আঁতিপাতি করে খুঁজে একটা খুঁত বার করল ভাঁটুনী। নিশির সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কর্কশ গলায় সে বলল, 'বউ মানুষ, তা অমন ডাকিন সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে ? সিঁদুর পরে নি কেনে ?

'ক্যামন করে প'রে বল। যার জন্যে সিঁদুর পরবে, সেই লোকটাই তো লেই।' গুপী বলতে লাগল, 'গেল বছর ওর সোয়ামী যুগেন মরেচে। সেই ঠেঙে নিশির সিঁদুর পরার সাদ জন্মের মতন ঘুচে গেচে।'

নিশির সোয়ামী নেই। সে জন্য এতটুকু দুঃখবোধ হচ্ছে না ভাঁটুনীর। চাপা- রুদ্ধশ্বাস গলায় সে বলল, 'নিশি তা হলে বেধবা !

'হ্যা।'

নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠল ভাঁটুনী, 'সব্বোনাশ !'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

ঘাড় গুঁজে গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলছে গুপী। আর গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে ভাঁটুনী।

আচমকা ভাঁটুনী বলে উঠল, 'আচ্ছা গুপী—'

'কী কইচ ?' খেতে খেতে গুপী মুখ তুলল।

'নিশির সোয়ামী তো মরে গেচে—'

'হ্যা।'

'তা ওর সোমসারে আর কে কে আচে ?'

'আর কেউ লেই। সোমসারে ও একেবারে একা।'

'অমন 'উপ' (রূপ) আর অই ডাকাবুকো বয়েস লিয়ে নিশি একা একা থাকে ?'

'হ্যা।'

কি একটু চিন্তা করল ভাঁটুনী। তারপর শুধলো, 'সোয়ামী মরেচে এক বছর। এর মধ্যে নিশি আবার বে' করে নি কেনে ?'

গুপী বলল, 'কেনে করে নি সে-ই জানে।'

'তুই জানিস না ?'

'আমি কেমন করে জানব !'

গুপীর কানের কাছে মুখ এনে খুব শান্ত গলায় ভাঁটুনী বলল, 'আমার মন কইচে, তুইও জানিস। লিচ্চয় জানিস।'

গুপী চমকে উঠল। কোন জবাব দিল না।

এক সময় গুপীর খাওয়া হয়ে গেল। খাড়ির জলে আঁচিয়ে দাওয়ায় এসে বসল সে।

নিজের ভাত বেড়ে নিতে নিতে ভাঁটুনী বলল, 'নিশির নিজের কইতে তো কেউ লেই। তা ওর চলে কি করে? কে ওকে খাওয়ায়?'

'কে আবার খাওয়াবে! ও নিজেই রোজকার করে। তাতেই চলে। অবিশ্যি—' বলতে বলতে গুপী থামল।

'অবিশ্যি কী?'

'রোজকারের ব্যাওস্থাটা আমিই করে দিইচি।'

'কি রকম?'

'লয়া বসতের মাছমারাদের বলে দিইচি, তারা ছেঁড়া জাল-গুলোন নিশিকে দিয়ে সারায়, লোতুন জাল বুনিয়ে লেয়। এর জন্য নিশি মজুরি পায়।'

'নিশির ওপর তোর বুঝিন খুব টান?' বলেই কথাটার কী প্রতিক্রিয়া হয়, বুঝবার জন্য গুপীর মুখের দিকে তাকাল ভাঁটুনী। কিন্তু না, রাতকানা দুর্বল চোখে গুপীর মুখের অস্পষ্ট একটা আদল ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারল না। প্রথম ইন্দ্রিয়টি পঙ্গু, বিকল। কাজেই দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কানদুটো খাড়া করে বসল সে। গুপীর গলার স্বরটাই একমাত্র ভরসা। স্বরের উত্থান-পতন, আবেগ বা উচ্ছ্বাস—এ সব দিয়েই নিশি সম্পর্কে গুপীর মনোভাবটা তার বুঝতে হবে।

কাঁপা গলায় গুপী বলল, 'না-না, টান-ফান কিছু লয়। হাজার হোক, নিশি আমার মিতের বউ। না খেয়ে মরবে! তাই রোজকারের—' কথাটা পুরো না করেই সে থামল।

ভাঁটুনী কিছু বলল না। ভাত মেখে খাওয়া শুরু করল।

এখন প্রায় মাঝ রাত।

যদিও অঘ্রাণ মাস, আজ তেমন কুয়াশা নেই। আকাশে অষ্টমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। আবছা আবছা জ্যোৎস্নায় নয়া বসত যেন সৃষ্টিছাড়া কুহকের দেশ।

খেতে খেতে ভাঁটুনী ডাকল, 'এ্যাই গুপী—

'কী?' সঙ্গে সঙ্গে গুপী সাড়া দিল।

'তোকে এট্টা কতা শুদোব?'

'কী কতা?'

একটু ইতস্তত করল ভাঁটুনী। তারপর বলে ফেলল, 'তোর সোমসারে আমায় কদ্দিন থাকতে দিবি?'

'লোতুন করে একতা শুদোচ্চ যে?'

'লোতুন করে দরকার হয়েচে তাই।'

'তুমায় আমি অনেকবার কয়েচি। আর একবার শুনে রাখ, য্যাদ্দিন বাঁচবে তুমায় আমি রাখব।'

'শুদু শুদু কেন মিচে কতাটা কইচিস গুপী!'

'মিছে কতা!'

'এক শ' বার। দু দিন পরেই তো তুই আমায় তাড়িয়ে দিবি।' নির্বিকার গলায় ভাঁটুনী বলল।

'কী কইচ পিসী! তুমায় তাড়াতে যাব কেনে!' অবাক চোখে ভাঁটুনীর দিকে তাকাল গুপী। বলল, 'না-না কক্ষনো তুমায় তাড়াব নি।'

'তুই তো কইচিস তাড়াবি নি। কিন্তু নিশি যদি তাড়াতে বলে?'

'নিশি তাড়াতে কইবে কেন?'

'যদি বলে?'

গুপী হকচকিয়ে গেল। বলল, 'তা হলে—'

'তা হলে তাড়িয়ে দিবি, কি বলিস।' ভাঁটুনী হাসল।

গুপী জবাব দিল না। চুপ করে রইল। এই চুপ করে থাকার মধ্যেই তার জবাবটা রয়েছে।

ভাঁটুনী আর কিছু বলল না। রাতঅন্ধ, ঝাপসা চোখে বার

[illegible] তাকাতে লাগল। স্পষ্ট কিছুই সে দেখতে পেল না। শুধু তার মনে হল, গুপী নামে এই রুক্ষ চোয়াড়ে মানুষটার নাকে খুব সূক্ষ্ম একটা দড়ি পরানো আছে। আর খুশিমত সেই দড়িটা ধরে যে টেনে থাকে, সে নিশি। নিশি ঠিকই বলেছিল, তার ইচ্ছার বাইরে যাবার উপায় গুপীর নেই।

সন্ধ্যেবেলা ভাঁটুনী ঠিক করেছিল, যেমন করে পারুক নিশি আর গুপীর সম্পর্কটা জেনে নেবে। সম্পর্কটা তার জানা হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাসন-কোসন মেজে এক সময় শুয়ে পড়ল ভাঁটুনী। ঘরের এক কোণে তার বিছানা, আর এককোণে গুপীর।

অনেকক্ষণ শুয়েছে ভাঁটুনী। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। সূঁচের মুখের মত তীক্ষ্ণ তিনটে ভাবনা অবিরাম তাকে বিঁধছে।

ভাঁটুনীর প্রথম ভাবনাটা নিশি সম্পর্কে। আজ বিকেলে নিশির যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে সেটা আদৌ সুখকর নয়।

দ্বিতীয় ভাবনাটা গুপী সম্পর্কে। গুপীটা নিশির একান্ত বশীভূত। বশীভূত বললে ঠিক বলা হয় না। নিশির কাছে নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিয়েছে সে। সঙের পুতুলের মত নিশির কথায় সে ওঠে-বসে-চলে-ফেরে। এটা খুবই ভয়ের কথা। কোনদিন হয়ত নিশি বলে বসবে, 'বুড়ীটাকে তাড়াও।' সঙের পুতুলটা বিচার করবে না। বিবেচনা করবে না। নিশি বলামাত্র তাকে দূর করে দেবে।

তৃতীয় ভাবনাটা নিজের সম্পর্কে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গুপীর সংসারে একটা আশ্রয় পেয়েছে। এটা হারালে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে।

এই ভাবনা তিনটে ভাঁটুনীকে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল। সিদ্ধান্তটা এই রকম। এখানে থাকতে হলে গুপীর মন থেকে নিশিকে সরিয়ে দিতে হবে। ভাঁটুনী প্রতিজ্ঞা করল যেমন করে হোক, নিশির কাছ থেকে গুপীকে ছিনিয়ে নেবে।

আঠার

আজই সেই পরশুদিন। অর্থাৎ বুধবার।

কথামত কুবেরের বাড়ি এল নটবর। উঠোনে ঢুকেই ডাকল. 'মুরুব্বি আচো—'

ঘরের ভেতর থেকে কুবের সাড়া দিল, 'কে, লটা লাকিন?'

'হ্যা।'

'আয়, ভেতরে আয়—'

নটবর ঘরের মধ্যে এসে বসল।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। ঘরের এককোণে রেড়ির তেলের পিদীম জ্বলছে। পিদীমটার সামনে ঝুঁকে এতক্ষণ জালে কাঠি পরাচ্ছিল কুবের। নটবরকে দেখে মুখ তুলল। জাল আর লোহার কাঠিগুলো একপাশে গুটিয়ে রেখে বলল, 'সেই সন্ঝে ঠেঙে তোর জন্যে বসে আচি। তা এ্যাত দেরি করলি কেনে?'

নটবর বলল, 'আর বলো নি মুরুব্বি। আজকের হাটে একটার পর একটা ঝামেলা জুটেচে। সে সব মিটিয়ে আসতে দেরি হঁয়ে গেল।'

'এ্যাতখানি রাত হঁয়েছে। আমি তো তোর আশা ছেড়েই দিইছিলম। ভেবেছিলম, আজ বুঝিন আর এলিই না।'

'আসব নি কি রকম! তুমায় সিদিন কতা দিইচি না!' বলেই নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে নটবর আবাব শুরু করল, 'এই লটা কুনোদিন কতার খেলাপ করে না।'

একটু চুপ।

তারপরেই কুবের শুধলো, 'কি খাবি লটা? তামাক না বিড়ি?'

'বিড়ি তো হরদম খাচ্চিই। বিড়ি খেয়ে খেয়ে মুখ বোদা মেরে গেচে। তুমি তামাকই খাওয়াও মুরুব্বি।' নটবর বলল, 'মুখটা বদলে লেওয়া যাক।'

হাতের সামনেই হুকো-কলকে-আগুন—সব কিছু মজুদ ছিল। নটবর বলামাত্র তামাক সেজে ফেলল কুবের। তারপর পালা করে দুজনে টানতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরখানা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

এক সময় কুবের বলল, 'এবেরে তার নামটা বল্—'

'কার নাম জানতে চাইচ?' নটবর শুধলো।

'যার নাম কইতে তুই এইচিস (এসেছিস)।'

নিজের মনে কি যেন ভেবে নিল নটবর। তারপর বলল, 'তার নাম নিশি।'

'নিশি!' কুবেরের গলাটা চমকে উঠল।

'হ্যা।'

'যুগেনের অই বেধবা বউটা।'

'হ্যা গো।'

'কী কইচিস লটা!' কুবেরের মুখচোখ এবং গলার স্বর থেকে বিস্ময় যেন উপচে পড়ল।

'ঠিকই কইচি মুরুব্বি।' নটবরের গলা খুব শান্ত শোনাল

বিস্ময়টা থিতিয়ে গেলে কুবের শুধলো, 'নিশিই তা হলে পেছন ঠেঙে কলকাটি লাড়চে?'

'হ্যা।'

'কেন?'

'স্বাখে হাত পড়েচে বলে।'

'গুপী ভামিকে বে' করবে, তাতে নিশির স্বাখে হাত পড়চে কেমন করে?'

'বজাতে পাচ্চ নি?'

'না।'

'আরে বাপু, এ তো সোজা কথা।' নটবর বলতে লাগল, 'নিশি মাগী আশা করে আচে গুপীকে গেরাস করবে। ইদিকে তুমি চাইচ গুপীকে জামাই করতে। এতে তার স্বাখে হাত পড়চে নি!'

কি বলবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। ...

নটবরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নটবর আবার বলল, 'গুপী হল নিশির মুখের খাবার। কেউ তাকে কেড়ে লিলে সে কি চুপ করে রইবে?'

কুবের উষ্ণ হয়ে উঠল, 'তার মুখ ঠেঙে আমি গুপীকে কেড়ে লিচ্চি না সে-ই আমার মুখ ঠেঙে কেড়ে লিচ্চে, একবার ভেবে ভ্যাখ লটা।'

অস্ফুট গলায় নটবর কি বলল, বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল সে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'ডাকিনটা কি মন্তরই যে করেচে! তার ফাঁদ ঠেঙে ছোঁড়াটা বেরুতে পারচে নি। য্যাতক্ষণ না সে মত দিচ্চে, কিছুতেই গুপী তুমার মেইয়েকে বে' করবে নি।'

'গুপী করবে নি ওর বাবা করবে।' উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত গলায় কুবের বলল, 'বে' করবে বলে চার বছর ধরে শালা আমায় ঝুলিয়ে রেকেচে। এ্যাখন নিশির ফাঁদে পড়লে তাকে ছাড়চে কে!'

'কী করবে শুনি।'

'কি আবার করব। এই অঘ্‌ঘান মাসের ভেতর গুপী শালার ঘাড় ধরে বে' করাব। ভেবো দেখে লিস।'

নটবর বলল, 'জোর করে বে' করাবে। তাতে কি ঠিক ফল ভাল হবে নি।'

'কেনে?'

'ঘরে মন বসবে নি গুপীর। ভামির ওপর টান আসবে নি। ঘুরে ফিরে নিশির কাচে দৌড়বে।'

এবার খুব চিন্তিত দেখাল কুবেরকে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলল, 'কতাটা ঠিকই কয়েচিস।'

আড়চোখে কুবেরকে দেখে নিল নটবর। তারপর বলল, 'আমার মাথায় এট্টা মতলব এয়েচে মুরুব্বি। সেটা যদি কাজে লাগাও, বে'র ব্যাপারে গুপীর ওপর জোর খাটাতে হবে নি।'

'কী মতলব, শুনি।'

'গুপার আগে তুমি নিশির বে'র ব্যাওস্থা কর।'

'নিশির বে'র ব্যাওস্থা করব! কী কইচিস লটা! তোর মাথাটা কি খারাপ হল।'

'মাথাটা আমার ঠিকই আচে মুরুব্বি।' নটবর বলে চলল, 'আমার মতলবটা ভাল করে তলিয়ে ছ্যাখো। নিশির বে'টা যদি আগে হয়, গুপী কার কাচে গে দাঁড়াবে? কে আর তার বে'তে বাগড়া দেবে? ত্যাখন দেখবে বাছাধন লিজের ঠেঙে তুমার কাচে দৌড়ে আসবে।'

'কতাটা মন্দ কোস (বলিস) নি লটা। কিন্তুক—'

'কিন্তুক কী?'

'এট্টা ব্যাপার আমি ভাবচি।'

'কী?'

'আমাকে তো নিশির বে'র ব্যাওস্থা করতে কইচিস—'

'হ্যা—'

'র করলম, কিন্তুক নিশি যদি বেঁকে বসে, সেই বে'তে রাজী না হয়?'

'এক'শ বার রাজী হবে। তুমি হলে মুরুব্বি, এই লদা বসতে থাকতে হলে তুমার কতায় রাজী না হয়ে তার উপায় আচে।'

'বেশ, নিশি না হয় রাজী হল।' কুবের বলল, 'কিন্তুক কার সনগে তার বে' দোব? কে তাকে বে' করবে?'

একটু ইতস্তত করল নটবর। তারপর হাতদুটো কচলে ফিস ফিস করে উঠল, 'বে' করার লোকের অভাব! তুমি কইলে আমিই করতে পারি।'

'তুই বে' করবি!' কুবের অবাক হয়ে গেল।

খুব অন্তরঙ্গ গলায় নটবর বলল, 'তুমার এট্টু উবগার হবে, সে জন্যে এট্টা বে' আমি করতে পারি না?'

কুবের জবাব দিল না।

নটবর বলতে লাগল, 'বে'টা একবার কর্যিয়ে ছ্যাখো। গুপীকে নিশির কাছ ঘেঁষতে দোব নি।'

একটুক্ষণ চুপ।

তারপর কুবের বলে উঠল, 'তা হলে বে'র ব্যাপারে তো নিশির সন্‌গে কতাবাত্তা কইতে হয়।'

'হ্যা।' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল নটবর।

'তার কাচে কবে যাওয়া যায় বল্ দিকিন।'

'আজই চল না—'

'আজ যাবি কি! কত রাত হযেচে, হুঁশ আচে?'

'তা হলে কাল চল।'

'কাল আমার এট্টু কাজ আচে। কাল যাওযা হবে নি।'

'তবে কবে যাবে?'

'পরশু-টরশু যে কুনো একদিন যাওয়া যাবে।'

'যাবার সোময় আমায় সনগে লিও কিন্তুক।'

'আচ্ছা।'

কথায কথায রাত বাড়তে লাগল। কুবের আর নটবর ছাড়া এখন নয়। বসতের একটা প্রাণীও আর জেগে নেই।

একসময় নটবর বলল, 'ঢের রাত হল মুরুব্বি। আজ যাই।'

'যা।' কুবের বলল।

উঠতে উঠতে নটবর বলল, 'নিশিকে এট্টু বুজিযে সুজিয়ে বলো, সে য্যান আমায বে' করে।'

'কইব।'

'বে'টা হলে তুমারই লাভ।'

'তোর বুঝিন লোকসান?' ভুরু দুটো কুঁচকে কুবের শুধাল।

নটবর উত্তর দিল না। চকিত হয়ে একবার কুবেরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল।

কুবের চেঁচাল, 'চোপ চোপ, এ্যাই লটা—'

উনিশ

গেঁওখালির বানভাসি লোকগুলোকে সঙ্গে করে ভূষণ এসে পড়ল।

এখনও ভাল করে সকাল হয় নি। পূব দিকের আকাশটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সূর্য উঠেছে কি-না, বোঝা যাচ্ছে না। দিনের প্রথম পাখিটি এখনও বাসা ছেড়ে বেরোয় নি।

নয়া বসতে ঢুকেই ভূষণ ডাকতে শুরু করল, 'কুবির, এ্যাই কুবির—'

ডাকাডাকিতে কুবেরই শুধু না, মোতি বিলাস কুঞ্জ নটবর—নয়া বসতের তাবত বাসিন্দা বেরিয়ে পড়ল। সবিস্ময়ে তারা দেখল, ভূষণের পেছনে বউ-বাচ্চা-জোয়ান-বুড়োর একটা দল গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে।

খুশী গলায় কুবের বলল, 'আমাদের কি ভাগ্যি গো ভূষোণদা! সক্কালবেলা উটেই তুমার মুখ দেখলম!'

'শুদু শুদু তুদের মুখ দ্যাখাতে আসি নি কুবির।' বলেই পেছনের দলটাকে দেখিয়ে আবার আরম্ভ করল, 'এদের জন্যেই আসতে হ'ল। সিদিন তুকে কতকগুলোন বানভাসি লোকের কতা কোয়েছিলম না?'

'হ্যা।'

'এরাই তারা।'

'অ।'

'তা এদের জন্যে জায়গা ঠিক করে রেখেচিস?'

'ঠিক করে কিচু রাখি নি। চারপাশে কত জায়গা পড়ে আচে। যেখানে হোক ঘরদোর তুলে লিলেই হবে।'

'তা হলে এরা রইল। তুই এদের সব ব্যাওস্থা করে দিস। আমি চলি।'

'আসতে না আসতেই যেতে চাইচ যে!' কুবের অবাক হয়ে গেল।

'কাজ আচে।' ভূষণ বলল।

'য্যাত কাজই থাক, এ্যাখন কিচুতেই তুমার যাওয়া হবে নি। তিন কোশ রাস্তা হেঁটে এয়েচ। জিরোও, চানটান করে খাওয়া-দাওয়া কর। তা' পর বিকেলের দিকে ছাড়া পাবে।'

'না-না, বিকেলে গেলে চলবে নি। এখুনি পাতিবুনেতে ফিরে আমায় তুকান (দোকান) খুলতে হবে।'

'একদিন তুকান বন্দ রাখলে এ্যামন কিচু ক্ষেতি হবে নি।' ভূষণ বলল, 'আমার হয়ত হবে নি। কিন্তুক আরেকজনের হবে।'

'কার ?' কুবের শুধলো।

'হীরু গাইনের।'

'হীরু গাইন কে গো ?'

'ই-দিককার লোক লয়। হীরুর বাড়ি কাকদ্বীপ।'

'তুমি তুকান না খুললে তার ক্ষেতি হবে কেনে ?' কুবের আবার প্রশ্ন করল।

উত্তরে ভূষণ যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম।

হীরু গাইন তার সর্বস্ব দিয়ে লাটে কয়েক বিঘে জমি কিনেছিল। জমিটা কিনেই সে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। মামলার ব্যাপারে আজ তুপুরে সে ভূষণের কাছে আসবে। অনেক ঘুরে ভূষণ একটা খবর জোগাড় করে রেখেছে। সেই খবরটার ওপর মামলার হারজিত—সব কিছু নির্ভর করছে।

ভূষণ বলতে লাগল, 'খপরটা আজই তার দরকার। তোর কতামতন বিকেল পয্যন্ত যদি রয়ে যাই, হীরু এসে ফিরে যাবে। তাতে তার ভীষোণ মুশকিল হবে।'

কুবের বলল, 'তা হলে তুমায় আর আটকে রাকব নি।'

একটু চুপ।

নিজের মনে কি যেন ভাবল কুবের। তারপর আবার শুরু করল, 'এইমাত্তর গেঁওখালির লোকগুলোনকে লিয়ে এলে। আবার এক্ষুণি ছুটচ হীরুকে খপর দিতে। লোকের উবগারের জন্যে

চেরকাল এ্যামন করে ছুটেই মরচ। কুথাও বসে ছ-দণ্ড যে জিরোবে, সে সোময় তুমার কুনোদিনই হ'ল নি।'

সারা জীবন যে মানুষটা শুধু তথ্য ছাড়া আর কিছুই জমা করে নি, এই মুহূর্তে সেই ভূষণ তত্ত্বান্বেষী হয়ে উঠল। বলল, 'বুজলি কুবির, মানুষকে বাঁচতে হলে নেশা হোক আনন্দ হোক, এট্টা কিচুর দরকার। লোকের জন্যে আমি যে ছুটে মরি, সেটা আমার আনন্দ। এই আনন্দটুকুন আচে বলেই আমি বেঁচে আচি।'

বলেই একটু হাসল ভূষণ। তারপর চলে গেল।

যতক্ষণ ভূষণকে দেখা গেল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কুবের। আপন মনে বলল, 'আশ্চয্যি লোক!'

গেঁওখালির দলটা এতক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে ছিল। ভূষণ চলে যেতেই তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'এবেরে আমাদের জায়গা-টায়গা দেখিয়ে দ্যাও মুরুব্বি।'

'হ্যা—হ্যা, চল—' কুবের ব্যস্ত হয়ে গেল।

দলটাকে সঙ্গে নিয়ে সারা নয়া বসত ঘুরে বেড়াল কুবের। কিন্তু পছন্দ মত জায়গা কোথাও মিলল না। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত গুপীর ডেরার সামনে এসে পড়ল তারা।

গুপীর বাড়ির ডান দিক ঘেঁষে একটা ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। মাঠটা লোকগুলোর খুব পছন্দ হ'ল। তারা বলল, 'এই জায়গাটা আমাদের ব্যাওস্থা করে দ্যাও মুরুব্বি। এখেনেই আমরা ঘর তুলতে চাই।'

কুবের বলল, 'বেশ তো।'

আশ্রয়ের খোঁজে প্রথমে এসেছিল কুবেররা। তারপর ভাঁটুনী। আজ এসেছে গেঁওখালির বানভাসি মানুষগুলো।

সমুদ্রের মুখে জীবনের মেলা জমে উঠতে শুরু করেছে।

বিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় এসে বসল নিশি। কাল রাত্রে, বলা নেই কওয়া নেই সারা গা কাঁপিয়ে হঠাৎ তার জ্বর এসেছিল। জ্বরটা যদিও এখন কম, শরীরটা ভারী দুর্বল লাগছে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা, স্নায়ুগুলো অবশ।

উদাস চোখে সামনের দিকে তাকাল নিশি। ঘরের পর দাওয়া। দাওয়ার পর উঠোন। উঠোনের শেষ মাথায় শিমূল গাছটা।

দু-বছর নিশিরা এখানে এসেছে। আর দু-বছর ধরে গাছটাকে একই রকম দেখছে। গাছটার গায়ে ডালপালা, পাতা—সবই আছে। কিন্তু ফুল নেই। কী দুর্ভাগ্য তার!

সজীব চেহারার এই শিমূলটা যেন নিশিরই প্রতীক। নিশিরও তো সবই আছে। স্বাস্থ্য আছে, রূপ আছে, প্রাণের গভীরে আকাঙ্ক্ষাও আছে। তবু ঐ শিমূলটার মতই নিজের জীবনে একটা ফুল ফোটাতে পারছে না সে।

ফুল অবশ্য নিশির জীবনে একবার ফুটেছিল, যখন রমেন বেঁচে ছিল। কিন্তু বড় অসময়ে সেই ফুলটা ঝরে গেছে। তারপর থেকে শিমূল গাছটার মতই সে নিষ্ফলা।

গাছটার দিকে তাকিয়ে নিশি বিড় বিড় করে উঠল, 'তুই আর আমি আছি বেশ। তোর ডালেও ফুল আসে না; আমার ডালেও না।' হাওয়ায় মাথা নেড়ে ফিস ফিস করে গাছটা বুঝি বা সায় দিল 'ঠিক।'

নিশি আবার বলল, 'আয় না, দুজনে মিলে ফুল ফোটাই।' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

হাসির রেশটা থামতে না থামতেই কে যেন ডেকে উঠল, 'মেইয়েছেলে—'

মুহূর্তে হাসি বন্ধ হ'ল। ঘুরে বসে নিশি দেখল, উঠোনের আর এককোণে গুপী দাঁড়িয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই গুপী বলল, 'একা একা অমন হাসছেলে যে—'

নিশি বলল, 'এমনি।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ওখেনে দাঁড়িয়ে আচো কেনে ; এদিকে এস।'

গুপী দাওয়ায় এসে বসল।

নিশি আবার বলল, 'সক্কাল বেলা উটেই চলে এয়েচ যে . আজ হাটে যাবে নি ?'

'না।' গুপী বলল, 'কাল রাত্তিরে একটা মাছও ধরতে পারি নি। শুদু হাতে গে কি করব।'

একটু চুপচাপ।

এতক্ষণ খেয়াল করে নি গুপী। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, নিশির চুলগুলো কেমন যেন রুক্ষ, মুখখানা শুকনো আর চোখদুটো একটুকে লাল। [illegible] শুধলো, 'তুমায় এ্যামন শুক-শুক দেখাচ্চে [illegible] গ ? শরীলটা খারাপ নাকিন ?'

'একটু জ্বর মতন হয়েচে। ও কিচু লয়।' নিশি বলল।

'লয় কি রকম ! মুখখানা এ্যাত্তটুকুন হয়ে গেচে' গুপীর গলায় উদ্বেগ ফুটল।

নিশি জবাব দিল না।

গুপী আবার বলল, 'কাল সকালেও তো আমি এয়েছিলুম। কই ত্যাখন তো জ্বর দেখি নি।'

'ত্যাখন জ্বর ছিল নি, তাই দ্যাখ নি।' নিশি একটু মুখ খুলল, 'জ্বর এয়েচে কাল রাত্তিরে।'

'তা আমায় খপর পাটাও নি কেনে ?'

'খপর পাটালে কী করতে ?'

তুমার কাচে এসে বসে রইতম। রুগী মানুষ— একা একা থাকা তুমার ঠিক হয় নি।'

নিশি হাসল। বলল, 'রাত্তির বেলা আমার ঘরে কাটিয়ে গেলে মানষে কী কইত ?'

'যা খুশি কইত। কারো কওয়া-কওয়ির ধার আমি ধারি না।' গুপী বলল।

'তাই নাকিন ?'

'হ্যা।'

'খুব সাহস দেখচি।'

'তা এট্টু আচে।'

'শুনে ভরসা পেলম।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ।

হঠাৎ গুপী বলে উঠল, 'এ্যাখন শরীলটা ক্যামন লাগচে ?'

'ভালোও লয় আবার খুব খারাপও লয়। ভালোমন্দের মাঝামাঝি।' আস্তে আস্তে নিশি উত্তর দিল।

'জ্বরটা ছেড়ে গেচে ?'

'কে জানে।'

'দেখি—' বলেই জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসের কাজটা করে বসল গুপী। নিশির কপালে একটা হাত রাখল।

নিশি যেন এর জন্যই উন্মুখ হয়ে ছিল। কপালের ওপব গুপীর হাতটা চেপে ধরে সে চোখ বুজল।

নিশি যে এমন করে হাতটা চেপে ধরবে, গুপীর পক্ষে এ ছিল অভাবিত। তার রক্তে 'ঘুরি বান' ডেকে গেল যেন। বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডটা প্রমত্ত হয়ে উঠল। স্নায়ুগুলো বশে নেই। নিশির মুঠির মধ্যে হাতটা থরথর করছে। কিছুতেই তার দেহের তাপটা বুঝতে পারছে না গুপী।

বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে অনেকখানি সময় কেটে গেল।

এক সময় খানিকটা ধাতস্থ হ'ল গুপী। বুঝতে পারল নিশির গায়ে বেশ জ্বর আছে। বলল, 'এ কি, গা যে তুমার পুড়ে' যাচ্চে !'

চোখ বুজে নিজের দেহে গুপীর প্রথম স্পর্শ অনুভব করছিল নিশি। ফিস ফিস করে সে বলল, 'পুড়ে যাচ্চে !'

'হ্যা।—'

'যাক।' বলতে বলতে চোখ মেলল নিশি। দৃষ্টিটা কেমন যেন আচ্ছন্ন ; সাঙঘাতিক নেশা করলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম।

'যাক কি গো!' গুপী অবাক হয়ে গেল।

নিশি জবাব দিল না।

এখনও হাত ধরে রেখেছে নিশি। গুপী বলল, 'ছাড়। আমি একবার হাট ঠেঙে ঘুরে আসি।'

হাত ছাড়ল না নিশি। বলল, 'এই কইলে হাটে যাবে নি। এ্যাখন আবার যেতে চাইচ যে!'

'তুমার জন্যে।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যা।' গুপী বলতে লাগল, 'পাতিবুনের হাটে একজন ভাল ডাক্তার এয়েচে! তার কাচ ঠেঙে এট্টু ওষুদ লিয়ে আসি।'

'জ্বর জ্বর করে তুমি দেখি পাগল হলে!'

'আমি পাগল না হলে, কে হবে শুনি। আর কে আচে তুমার?' গুপী বলল, 'হাত ছাড়, যেতে ছ্যাও।'

'না-না, ওষুদ-টোষুদ আনতে হবে নি।' নিশি বলল।

'জ্বরটা বুঝিন সারাতে চাও নি।'

'আমার এ্যামন কিছু গরজ লেই। লিজের ইচ্চেয় সে এসেচে.. আবার য্যাখন ইচ্চে হবে, চলে যাবে। জ্বর সারাবার জন্যে কষ্ট করে ওষুদ গিলতে পারব নি বাপু।'

'তুমার কুনো কতা শুনতে চাই না। ওষুদ এনে দিচ্চি, তুমায় খেতে হবে।'

'তুমার কতায় খেতে হবে?'

'লিচ্চয়।'

নিশি বলল, 'আমার ওপর তুমার খুব জোর দেখচি—'

গুপী বলল, 'হ্যা জোর, এক শ' বার জোর।'

নিশির দুই ঠোঁটের ফাঁকে চিরদিনের সেই সূক্ষ্ম হাসিটা ফুটল সে বলল, 'এ্যাত যে জোর খাটাতে চাইচ, তুমি আমার কে?'

এবার খুব বিপন্ন দেখাল গুপীকে। সে জবাব দিল না। মুখ নামিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

'তুমি আমার কে?' এই প্রশ্নটা পরস্পরকে তারা আরো অনেকবার করেছে। প্রশ্নের উত্তরটা তারা ভাল করেই জানে। তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে, তাদের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উত্তরটা একাকার হয়ে মিশে আছে। তবু মুখ ফুটে কোনদিন সেটা তারা বলতে পারে নি। বুঝি বা তা বলাও যায় না। শুধু অনুভবই করা যায়।

অন্য সব দিন প্রশ্নটা করেই চুপ করে গেছে নিশি জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করে নি। আজ কিন্তু সে জেদ ধরল, 'অমন মুখ বুজিয়ে রইলে চলবে নি। বল, তুমি আমার কে? কইতেই হবে—'

একে জ্বরের ঘোরে মুখচোখ অস্বাভাবিক, তার ওপর সৃষ্টিছাড়া একটা জেদ ধরেছে নিশি। তার কথার কী জবাব দেওয়া উচিত, বুঝে উঠতে পারল না গুপী। কি বললে নিশি খুশী হবে, কে জানে। অনেকক্ষণ ভেবে ভয়ে ভয়ে গুপী বলল, 'কে আবার আমি, তুমার কেউ লই।'

'সত্যি কইচ!'

'হ্যা।'

কি একটু চিন্তা করল নিশি। তারপর একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। বলল, 'জান, সিদিন তোমাদের বাড়ি গিছলম—'

'জানি।'

'ভাঁটুনী বুড়ীর সনগে অনেক কথা হল। নানান কথা কইতে কইতে সে আমায় এট্টা পশ্ন শুদিয়েছেল—'

'কী পশ্ন?'

'শুদিয়েছেল, 'গুপী তোর কে?' আমি কী কয়েছিলম, বল তো।'

'কী কয়েছেলে?' গুপী উদ্‌গ্রীব হল।

নিশি বলল, 'এট্টু আগে তুমি যা কইলে, ঠিক তাই। কয়েছিলম গুপী আমার কেউ লয়। এক্কেবারে পর।'

মুহূর্তে গুপীর মুখটা বিবর্ণ এবং ব্যথাতুব হয়ে উঠল। একদৃষ্টে গুপীব দিকে তাকিয়ে ছিল নিশি। বলল, 'ওকি, তুমাব মুখখানা অমন কালো হযে গেল কেন গো?' তাব গলাব স্ববে যুগপৎ কৌতুক এবং বহস্য।

'কই, না তো!' গুপী হাসতে চেষ্টা কবল। পাবল না।

অনেকক্ষণ চুপ কবে বইল নিশি। তাবপব আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি আমি দু-জনেই মিছে কতা কযেচি। তুমি কযেচ আমাব কাচে, আমি কযেচি ভাঁটুনী বুড়ীব কাচে। কিন্তুক আসল কতাটা কী জান?'

'কী?'

'তুমি আমাব পব লও।'

গুপীব চোখ দুটো চকচক কবে উঠল। অস্থিব গলায সে বলল, 'পব লই!'

'না।' নিশি বলতে লাগল, 'পর হলে আমাব জ্ববেব জন্যে তুমি পাগল হতে নি। পব হলে যুগেন মববাব পব এই এক বচ্ছব কাব জন্যে বসে আচি!'

'কাব জন্যে?' প্রায অস্ফুট গলায গুপী শুধলো।

'কাব জন্যে, বোঝ না!' নিশি তাকিযেই আছে। তাব চোখ দুটো উদ্ভ্রান্ত সবনাশা।

গুপী উত্তব দিল না।

উদ্ভ্রান্ত এবং তৃষিত গলায় এবাব নিশি বলে উঠল, 'শুধু তুমাব জন্যে। তুমি ছাড়া আমি মিছে। আমাব বেঁচে থাকা মিছে।'

সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় যে কথা কোনদিনই হযত বলতে পাবত না, জ্ববেব ঘোবে কত সহজে তা বলে ফেলেছে নিশি। এতকাল যা ছিল আভাসে ইঙ্গিতে, তাকে একেবাবে অনাবৃত কবে দিযেছে সে। চমকে নিশিব দিকে তাকাল গুপী। দেখল, নিশিও তাব দিকেই তাকিযে আছে। কেউ আব কিছু না বলে পবস্পবেব দিকে একদৃষ্টে তাকিযে বইল। দু-জনেবই কেমন যেন ঘোব লেগে গেছে।

এক সময় ঘোর কাটল। দু-জনেই এখন চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

গুপী ভাবছে, সেদিন গগন ওস্তাদ তাকে নিশির মর্ন জানতে বলেছিল। এইমাত্র তার মনটা জানা হয়ে গেছে।

বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। রীতিমতো রোদ উঠে গেছে। হেমন্তের আকাশটা আজ আশ্চর্য নীল। সেখানে একঝাঁক সুকুলে পাখি অলস ডানায় উড়ছে।

হঠাৎ গুপী ডাকল, 'মেইয়েছেলে—'

'বল—' নিশি পাশ থেকে সাড়া দিল।

'ভামির সন্‌গে বে' দেবার জন্যে মুরুব্বি বড্ড পেছু লেগেচে। ভাবচি, এখেন ঠেঙে কুথাও চলে যাব।'

শব্দ করে হেসে উঠল নিশি। হাসতে হাসতেই বলল, 'বে'র ভয়ে শেষমেষ দেশান্তরী হবে! তুমি না পুরুষ মানুষ!' একটু থেমে আবার, 'তা একাই যাচ্চ?'

একটু ইতস্তত করল গুপী। বলল, 'না।'

'তবে আর কাউকে সন্‌গে লিচ্চ নাকিন?' নিশি ফিসফিস করল।

গুপী একটা ঢোক গিলল। নিশির দিকে একবার তাকাল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তার কথার জবাবটা দিতে পারল না। চিরকালের ভীরুতা গুপীর গলাটাকে রুদ্ধ করে রাখল।

খিল খিল করে আবার হেসে উঠল নিশি।

একুশ

অকালে মেঘ ঘনাল।

ঝড়বৃষ্টির পক্ষে এটা সুসময় নয়। অঘ্রান মাস শেষ হতে চলেছে। নয়া বসতের ঘরে ঘরে নতুন ধান উঠে গেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রায় এখন থেকেই শীত পড়ার কথা। কিন্তু সমুদ্রমুখের প্রকৃতি কোন নিয়মেরই বশীভূত নয়। সে অস্থির, খেয়ালী এবং হঠকারী। শীতের বদলে সে মেঘ নিয়ে এল।

ক'দিন ধরেই টুকরো টুকরো মেঘেদের আনাগোনা শুরু

...মেঘগুলো নিরীহ, আয়েশী। তাদের দেখে ভয় পাবার কথা নয়। কিন্তু আজ সকালবেলা তারা রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

টুকরো টুকরো মেঘেরা মিলেমিশে একাকার হয়ে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। সমুদ্রের দিক থেকে 'ঘুংরি' বাতাস ছুটে আসছে। মেঘ আর বাতাসের সঙ্গে তাল মেলাবার জন্যই বুঝি বা খাড়ির মুখে বড় বড় ঢেউ উঠছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই গুপীরা দু-ভাই হাটে চলে গেছে। একটু পরে ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে ভাঁটুনীও বেরিয়ে পড়ল। ক'দিন থেকেই সে বেরুব বেরুব করছিল কিন্তু ফুরসৎ পাচ্ছিল না। কারণ এর মধ্যে গুপীদের জমি থেকে ধান উঠেছে আর সেই ধানের হেপাজত নিয়ে কাল পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

অসময়ের মেঘ মাথায় নিয়ে সারা সকাল ঘুরে বেড়াল ভাঁটুনী। সমস্ত নয়া বসত ঘুরে শেষ অবধি একটা খবর জোগাড় করল। খবরটা এই রকম: অনেকদিন ধরে মুরুব্বির মেয়ে ভামিনীর সঙ্গে গুপীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। বিয়েটা কয়েক বছর আগেই হয়ে যেত; নানা কারণে হয় নি। এতকাল বিয়েতে রাজীই ছিল গুপী। কিন্তু ইদানীং যোগেন মরবার পর নিশি যেদিন বিধবা হল সেদিন থেকেই সে নাকি টালবাহানা শুরু করেছে। কিছুতেই ভামিনীকে বিয়ে করতে চাইছে না। ফলে মুরুব্বি ক্ষেপে উঠেছে এবং ঠিক করেছে, অঘ্রান মাসের মধ্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবে। অবশ্য গোলমালের আশঙ্কা আছে। কেননা গুপী নিশির দিকে এত বেশি ঝুঁকেছে যে সহজে তাকে ভামিনীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যাবে না।

খবরটা মোটামুটি আশাপ্রদ। মনে মনে খুবই খুশী হল ভাঁটুনী। প্রতিজ্ঞা করল, যাতে গোলমাল না করে সেজন্য গুপীকে সে বোঝাবে। এবং এই বিয়েতে সবরকমভাবে মুরুব্বিকে সাহায্য করবে।

সাহায্যটা একেবারে অকারণে নয়। ...

কারণ কৃতজ্ঞতা। প্রথম যেদিন সে এখানে এসেছিল, কুবেরই গুপীর কাছে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই উপকার ভাঁটুনী ভোলে নি।

দ্বিতীয় কারণ স্বার্থ। এটাই আসল কারণ। ভাঁটুনীর কেমন যেন ভয় হয়েছে, নিশি যদি গুপীর সংসারে এসে ঢোকে, একটা দিনও সে টিকতে পাববে না। এখানে টিকে থাকতে হলে যেমন করে হয় এবং যত তাড়াতাড়ি হয় মুরুব্বির মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

গুপীর বিয়ের ব্যাপারে সারাদিন ভাবল ভাঁটুনী। ভাবনার ঘোরেই রাঁধল-বাড়ল-খেল, এমন কি দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়েও নিল। তারপর ঘুম থেকে উঠে সোজা দাওয়ায় এসে বসে রইল।

এখন বিকেল।

আজ একটু আগে আগেই হাট থেকে ফিরে এল গুপী। তার জন্যই উন্মুখ হয়ে বসে ছিল ভাঁটুনী।

গুপী বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটুনী বলে উঠল, 'কথাটা এ্যাদ্দিন কোস (বলিস) নি কেন রে গুপী? লজ্জা করছেল বুঝিন?

একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল গুপী। তারপর শুধলো, 'কী কথা পিসী?'

'আয়, আমার কাচে আয়। তা' পর কইচি—'

আস্তে আস্তে ভাঁটুনীর কাছে এসে বসল গুপী।

ভাঁটুনী বলল 'মুরুব্বির মেইয়ে ভামির সনগে তোর নাকিন বে' হবে!'

'কে কইলে!' গুপী চমকে উঠল।

'কার নাম আর করব। পিরথিমীশুদ্দু সবাই কইচে।' ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'মুরুব্বির মেইয়েকে বে' করবি, তোর কি ভাগ্যি!'

'মুরুব্বির মেইয়েকে বে' করা ভাগ্যির কথা, এক শ' বার তা মানচি। কিন্তুক—'

'কেনক রা?'

'আমার মনের ভেতর এট্টা ধন্দ আচে পিসী।'

ধন্দটা যে কী জন্য, খুব ভাল করেই জানে ভাঁটুনী। সব জেনেশুনেও সে শুধলো, 'কিসের ধন্দ?'

গুপী বলল, 'ভামিকে বে' করব কি-না, বুঝে উঠতে পারচি নি।'

গুপীর কাছ থেকে ঠিক এই জবাবটাই আশা করেছিল ভাঁটুনী। তবু চোখেমুখে নকল বিস্ময় ফুটিয়ে সে বলল, 'কী কইচিস গুপী!'

গুপী বলল, 'ঠিকই কইচি।'

একটু চুপ।

গুপীই আবার শুরু করল, 'আচ্ছা পিসী—'

'বল্—' পাশ থেকে সাড়া দিল ভাঁটুনী।

'আমি যদি ভামিকে বে' না করি, কী হয়?'

'অমন কথাও মুখে আনিস নি গুপী!' ভাঁটুনী বলতে লাগল, 'ভেবে দ্যাখ্, ক' বচ্ছর ধরে মুরুব্বিকে আশা দিয়ে রেখিচিস। লয়া বসতের সব্বাই জানে, তুই তার মেইয়েকে বে' করবি। এ্যাখন যদি না করিস, সে ভারি অধম্ম হবে।'

'অধম্ম হবে, লয়?'

'লিচ্চয়।'

'তা হলে—' কথাটা শেষ করল না গুপী। ভারি চিন্তিত দেখাল তাকে। অধর্মের কথায় তার মনের ভেতর আলোড়ন শুরু হয়েছে।

ভাঁটুনীর চোখদুটো রাত্তিরে অন্ধ কিন্তু দিনের বেলা আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আর দূরগামী। গুপীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তার মনের অবস্থাটা টের পেল সে।

মাসখানেক হল ভাঁটুনী এখানে এসেছে। এরই মধ্যে গুপীর স্বভাবের প্রায় সবটুকুই তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। এমনিতে ছেলেটা চমৎকার। সৎ, শান্ত এবং সহৃদয়। সবই তার গুণ কিন্তু মস্ত একটা দোষও আছে। ভারি দুর্বলচিত্ত গুপী। যদি সে

ডাকাবুকোই হত, অধর্মের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ত না। স্পষ্টাস্পষ্ট বলে দিতে পারত, 'অধম্মই হোক আর যাই হোক, ভাগ্নিকে আমি বে' করতে পারব নি।'

মনের দিক থেকে গুপী শুধু দুর্বলই নয়; তাব না আছে ব্যক্তিত্ব, না কোন বিষয়ে দৃঢ়তা। ফলে যে কোন সময় যে কেউ তাকে লুট করে নিতে পারে।

নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে এতকাল মুরুব্বি তাকে দখল করে রেখেছিল। ইদানীং মুরুব্বির কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে নিশি। এরপর নিশির চেয়ে প্রবলতর কেউ যদি গুপীর হাত ধরে টান দেয়, সে (গুপী) তাব মুঠোর মধ্যেই চলে যাবে।

মনে মনে ভাঁটুনী ভাবল, গুপীর দুর্বল স্বভাবের সুযোগ এবার থেকে আর কারুকেই নিতে দেবে না। যা নেবার সে নিজেই নেবে এবং প্রচণ্ডভাবেই নেবে।

হঠাৎ ভাঁটুনী ডেকে উঠল, 'গুপী—'

'কী কইচ?' গুপী মুখ তুলল।

'তোকে এট্টা কথা কইব।'

'বল—'

খুব চতুর এবং সতর্কভাবে এগুতে লাগল ভাঁটুনী, 'তুই আমায় পিসী বলে ডেকিচিস। আমি তোর মায়ের মতন। আমি কইচি মুরুব্বির মেইয়েকে বে' কর। এতে তোর ভাল হবে।'

'ভাল যে হবে জানি। কিন্তুক—'

'কী?'

'ছ্যাখ পিসী, ক'দিন ঠেঙেই তুমায় এট্টা কতা কইব কইব, ভাবছিলম। মুখ ফুটে কইতে পারচিলম নি। আজ য্যাখন বে'র কতাটা তুললে ত্যাখন কইচি। সব শুনে বল আমার কী করা দরকার।' গুপী বলতে লাগল, 'মুরুব্বির মেইয়েকে বে' করব, এ্যাদ্দিন এটাই ঠিক ছেল। কিন্তুক তাকে সরিয়ে আর একজন সামনে এসে দেঁড়িয়েচে। তার কাচে আমার অনেক দায়। অনেক—'

গুপীর কথা শেষ হতে দিল না ভাঁটুনী। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'যার কাচে য্যাত দায়ই থাক, মনে রাখিস মুরুব্বির কাচে তোর দায়টা সব চাইতে বেশি। মুরুব্বিকে তুই কতা দিইচিস।' একটু থেমে আবার বলল, 'সোমসারে মানুষের কতাটাই সব। তার চাইতে দামী আর কিচু লেই।'

'সবই জানি পিসী। তবু—'

'তবু কী?'

গুপী জবাব দিল না। অনেকদূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। বোঝা গেল, নিশি এখনও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভাঁটুনী ভাবল, গুপীর মন থেকে নিশির নেশা একদিনে ছুটবে না। একটু একটু করে ছোটাতে হবে।

বাইশ

মেঘে মেঘে আকাশটা ছয়লাপ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। কখনও ফোঁটায় ফোঁটায়। কখনও বা জোরে জোরে, প্রবল বেগে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অসময়ের মেঘ সহজে বেহাই দেবে না।

সবেমাত্র সন্ধ্যে। এরই মধ্যে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়েছে নিশি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। গোলপাতার চালে ঝম ঝম শব্দ হচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ মেশানো। নিটোল একটি ঘুমের পক্ষে সমস্ত আয়োজনই রয়েছে। তবু নিশির ঘুম আসছে না।

শুধু আজ বলেই না, যোগেন মরার পর কোনদিনই শোবার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসে না। দিনের বেলাটা নানা কাজে একরকম কেটে যায়। কিন্তু রাত্রিগুলো আর পার হতে চায় না। এ-সময়টা নিজেকে ভারি নিঃসঙ্গ মনে হয় তার।

আজও শুয়ে শুয়ে নিশি ভাবতে লাগল [illegible] যে তার সঙ্গসুখহীন-নিরুৎসব জীবন শেষ হবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গুপীকে মনে পড়ল। বুকের গভীরে যে গুহায়িত কামনাটা সারাদিন মুখ বুজে থাকে, এই মুহূর্তে সেটা অবুঝ হয়ে উঠেছে। কিছুতেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না।

ঠিক এই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

নিশি চমকে উঠল। যোগেন মরার পর প্রথম প্রথম এমন টোকা পড়ত। গুপী সেটা থামিয়ে দিয়েছিল। আবার কি তবে নতুন করে উৎপাত শুরু হল!

একটুক্ষণ দম বন্ধ করে রইল নিশি। তারপর তীক্ষ্ণ ভীত গলায় চেঁচাল, 'কে?'

'আমি রে, আমি।' বাইরে থেকে সাড়া এল, 'তাড়াতাড়ি দুয়োর খোল। বিষ্টিতে একদম ভিজে গেলম।'

গলার স্বরেই লোকটাকে চেনা গেল। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য নিশি শুধলো, 'মুরুব্বি নাকিন?'

'হ্যা রে, হ্যা। ডর লেই—'কুবের অভয় দিল।

ভয় ঘুচেছে। বিছানা থেকে নেমে হ্যারিকেন জ্বাল্লাল নিশি। তারপর দরজা খুলল।

কুবের ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। তার পেছন পেছন এল নটবর। দু-জনেই প্রচুর ভিজেছে।

আড়চোখে একবার নটবরকে দেখে নিল নিশি। তার মনটা যুগপৎ সন্দিগ্ধ এবং বিরূপ হয়ে উঠল।

ঘরের চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে কুবের বলল, 'শুয়ে পড়েছিলি বুঝিন?'

'হ্যা।' নিশি মাথা নাড়ল।

'তা হলে তো এ সোময় এসে তোকে কষ্ট দিলম।' একটু যেন লজ্জিতই হল কুবের।

'আমার আর কষ্ট কি! শুয়েছিলম, উটে শুদু দুয়োরটা খুলে

দিলম। কষ্ট হয়েছে সে তুমাদের, বিষ্টিতে একেবারে নেয়ে গেছ—বলেই নিশি জিগ্যেস করল, 'হটাৎ এ্যামন ভিজতে ভিজতে এলে যে?'

'সাধে কি আর এইচি রে, এইচি পেরাণের দায়ে। তোর সন্‌গে খুব দরকারী কতা আচে।'

'কী কতা?'

'সব কইব। তার আগে এট্টা শুকনো গামচা-টামচা থাকলে দে দিকিন। মাথাটা মুছে লিই।'

কুবেরের হাতে একটা গামছা দিল নিশি।

হাত-পা-মাথা—সারা শরীর মুছে কুবের আর নটবর ঘরের এক কোণে গিয়ে বসল।

নিশি বলল, 'এবেরে বল—'

খাকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল কুবের। তারপর শুরু করল, 'ছাখ নিশি, তোর ব্যাপারে আমার এট্টা অন্যায় হয়ে গেচে!'

অবাক চোখে কুবেরের মুখের দিকে তাকাল নিশি। বলল, 'কী কইচ মুরুব্বি!'

'ঠিকই কইচি রে। তোর পিতি (প্রতি) আমার এট্টা কত্তব্য আচে। এ্যাদ্দিন সেটা বেস্মরণ হয়ে ছেলম। এতে ভারি অন্যায় হয়েছে।' অপরাধীর মত মুখ করে বসে রইল কুবের।

'আমার পিতি তুমার কী কত্তব্য থাকতে পারে। কিচুই তো ছাই বুঝচি না!'

'বুঝচিস না?'

'না।'

'তবে শোন—' নিজের মনে কি একটু ভেবে কুবের বলতে লাগল, 'আমি এখেনকার মুরুব্বি। হাজার হোক, তুই আমার মেইয়ের মতন। এক বচ্ছর হল যুগেন মরেচে, তুই বেধবা হইচিস, মাথার ওপর তোর কেউ লেই। এ্যামন অবস্তায় আমার কী কত্তব্য ছেল? কত্তব্য ছেল উয্যুগী (উদ্যোগী) হয়ে তোর বে দেওয়া।'

'বে দেওয়া !' নিশি চমকে উঠল।

'লিচ্চয়।' কুবের বলল, 'এট্টা বছর আমার দোষে লষ্ট হল। তা যা হয়েচে, তার জন্যে ভেবে কি করব! এ্যাখন আমার ইচ্চে, তুই বে করে আবার সোমসারী হ।'

অসময়ের বর্ষায় ভিজতে ভিজতে কেন যে কুবের এসেছে, এতক্ষণে বোঝা গেল। আস্তে আস্তে নিশি বলল, 'গতর খাটিয়ে রোজকার করে খাই, কারো ধার ধারি না। ফের বে' না করে এই তো বেশ আছি মুরুব্বি।'

'একে বেশ থাকা বলে না?'

'কেন?'

'তুই হলি যুবুতী মেইয়ে, খা-খা আগুন। পুড়ে মরবার জন্যে তোর চারপাশে বাদলা পোকাগুলোন উড়চে।' কুবের বলতে লাগল, তোর এ্যামন একা-একা থাকা উচিত লয়। এতে বিপদ আচে। কোন দিন কী হয়ে যাবে।'

নিশি জবাব দিল না।

কুবের থামে নি, 'তাই কইচিলম, বে' কর। এতে তোর ভাল হবে।'

এবারও নিশি চুপ।

সোজাসুজি নিশির দিকে তাকিয়ে কুবের আবার বলল, 'তোর জন্যে ছেইলে ঠিক করে রেখিচি। তোর মতটা পেলেই বে'র ব্যাওস্থা করব।'

'ছেইলে ঠিক করে রেখেচ।' এতক্ষণে মুখ খুলল নিশি।

'হ্যা রে।'

'কাকে?'

একটু ইতস্তত করল কুবের। বলল, 'এই লয়া বসতেই থাকে।'

'আমি তাকে চিনি?'

'চিনিস বৈকি।'

'তা হলে নামটা কয়েই ফ্যাল।'

'কইব।' বলেও অনেকক্ষণ দ্বিধা করল কুবের। তারপর বলল, 'আজ থাক, পরে শুনিস। শুধু এট্টুকুন জেনে রাখ, ছেইলে খুব ভাল।'

'নামটা আজই শুনব মুরুব্বি। আমারও তো পছন্দ-অপছন্দ বলে এট্টা কতা আছে। ছেইলেটা কে না জানতে পারলে ক্যামন করে বে'তে মত দিই বল।'

খুক খুক করে একটু কাশল কুবের। কাশতে কাশতে মনঃস্থির করল। নটবরকে দেখিয়ে বলল, 'ছেইলে হল আমাদের এই লটবর (অন্য সময় তাকে লটা বলে ডাকে কুবের)। ছোট বয়েস ঠেঙে তো ওকে দেখছি, ওর ভেতর কনো বেচাল লেই, চোমৎকার ছেইলে।'

নটবরের দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। কুবেরের প্রশংসায় মুখ নীচু করে সে নখ খুটছে।

নিশি কিছু বলল না। মনে মনে সে যা সন্দেহ করেছিল হুবহু মিলে গেছে। এতদিন নিজে এসে সুবিধা করতে পারে নি নটবর। তাই বুঝি মুরুব্বিকে ডেকে এনেছে।

কুবের বলতে লাগল, 'লটবরের সনগে বে হলে সারা জীবন তুই সুখে থাকবি।'

'তাই নাকিন?' নিশির গলায় কতখানি ব্যঙ্গ আর কতখানি কৌতূহল, ঠিক বোঝা গেল না।

কুবের বলল, 'হ্যা।'

একটু চুপ।

এসময় নিশি বলে উঠল, 'লটবরের জন্যে তুমি অন্য মেইয়ে দ্যাখো মুরুব্বি।'

'কেন?' প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে কুবেরের ভুরু দুটো কুঁকড়ে গেল যেন।

'আমি যামন আচি তামনই থাকতে চাই। বে'তে আমার মত নেই।'

'বে' তোকে করতেই হবে, আর উই লটাকেই।' কুবের উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'জোর?'

'ভাল কতায় না শুনলে জোরই করতে হচ্চে।'

অদ্ভুত শান্ত গলায় নিশি বলল, 'তা হলে তাই কর।'

'তা-ই করব।' বলেই হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল কুবের, 'পষ্ট কতাটা শুনে রাখ নিশি, মনে মনে যা ঠিক করে রেখিচিস, তা হবে নি।'

'আমি কি ঠিক করে রেখিচি, তুমি জান?' নিশি শুধলো।

'জানি, একশ'বার জানি। শুদু আমি কেন, লয়া বসতের সব্বাই জানে, গুপীকে তুই গেরাস করতে চাইচিস। কিন্তুক তা আমি হতে দোব নি।' কুবের শাসাতে লাগল, 'লিজের ভাল চাস তো গুপীর আশা ছাড়। ওর দিকে ফের হাত বাড়ালে ফ্যাসাদে পড়বি।'

নিশি কিছু বলল না। নিষ্পলক শাণিত চোখে কুবেরের দিকে তাকিয়ে রইল।

এখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

কখন যে কুবেররা চলে গেছে, হুঁশ নেই। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে চুপচাপ বসে আছে নিশি। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা। তার ফাঁক দিয়ে যতদূর চোখ যায়, অথৈ অন্ধকার।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। গেমোবনে ঝিঁঝি ডাকছে। হঠাৎ শুনলে মনে হয়, ওটা ঝিঁঝির ডাক না, পৃথিবীর বুকের অতল থেকে উঠে-আসা আদিম আর দুর্বোধ্য একটা বিলাপ।

তেইশ

কাল রাত্রে নিশিকে শাসিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি কুবের। আজ সকালে তাই ঘুম থেকে উঠে সোজা গুপীর বাড়ি চলে এল। কুবের একা আসে নি, সঙ্গে করে নটবর-বিলাস-কুঞ্জ এমনি জন দশেককে এনেছে।

দূর থেকে দেখা গেল, ঘরের দাওয়ায় বসে ধান ঝাড়ছে ভাঁটুনী। কাছাকাছি এসে কুবের ডাকল, 'বুড়ো মেইয়ে, শুনচ—'

খুব নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল ভাঁটুনী। ডাকটা কানে যেতেই মুখ তুলল। মুখ তুলেই একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'মুরুব্বি তুমি!'

'হ্যাঁ, আমিই—'

'এই সক্কালবেলা কী মনে করে গো?'

'এট্টু দরকার আচে।'

'এস, উঠোন ঠেঙে ওপরে এস। বলেই দাওয়ার উপর খানকতক চাটাই বিছিয়ে দিল।

সবাইকে নিয়ে কুবের দাওয়ায় এল। বসতে বসতে বলল, 'গুপী ঘরে আচে?'

'আচে ঘুমুচ্চে—'

'তাকে এট্টু ডেকে দিতে হবে যে—'

'দিচ্চি।'

ভাঁটুনী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এককোণে বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে গুপী।

এ সময়টা অর্থাৎ হেমন্তের শেষাশেষি নয়া বসতের ঘরে ঘরে ঘুমের মরসুম পড়ে। বিশেষ ঠেকা না থাকলে এখন আর কেউ হাটে যায় না। না যাওয়ার কারণ দুটো। প্রথম কা··, সমুদ্র এ সময় কৃপণ হয়ে যায়। সারা রাত জাল বাইলে এক সের দেড় সের মাছ পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। ঐ সামান্য মাছ নিয়ে হাটে যাওয়া পোষায় না। দ্বিতীয় কারণ, এ-সময় ঘরে নতুন ধান থাকে। কাজেই রোজগারের জন্য বিশেষ চিন্তা বা চেষ্টা নেই।

সারা বছর রাত জাগার পর নয়া বসতের বাসিন্দারা অঘ্রানের শেষে প্রাণ ভরে ঘুমোয়।

গুপীর গায়ে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে ভাঁটুনী ডাকল, 'হেই গুপী ওঠ—'

ধড়মড় করে উঠে বসল গুপী। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'অমন ডাকাডাকি করচ কেনে ?'

গুপীর গলাটা বিরক্ত শোনাল। ঘুম ভাঙাবার জন্য সে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

ভঁটুনী বলল, 'শুদুমুদু কি আর ডেকেচি। বাইরে গে দ্যাখ, কারা এয়েচে—'

'কারা ?'

'উটেই যা না বাপু, গেলেই দেখতে পাবি।' বলে বেরিয়ে গেল ভঁটুনী।

অগত্যা উঠতেই হল গুপীকে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বাইরে এল সে। আর এসেই কুবেরদের দেখে চমকে উঠল। ঘুমের যেটুকু জড়তা ছিল, মুহূর্তে কেটে গেল।

সস্নেহে কুবের ডাকল, 'আয় গুপী, আমার কাছে এসে বোস।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুবেরের কাছে গিয়ে বসল গুপী।

কুবের জবাব বলল, 'ঘুমচ্চিলি বুঝিন ?'

'হ্যা।' গুপী ঘাড় কাত করল।

'তা তোর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলম বাপু। মনে কিচু করিস নি।'

'মনে করার কি আচে !'

চোখ বুজে কি একটু ভাবল কুবের। বলল, 'পাঁজিতে আচে আজকের দিনটা খুব ভাল। তাই কুঞ্জ, লটা এদের সব লিয়ে এইচি। আমার ইচ্চে এদের সামনে তোর সনগে কতাবাত্তা পাকা করে ফেলি।'

'কিসের কতাবাত্তা ?'

'কিসের আবার, তোর বে'র।'

মনে মনে এটাই আন্দাজ করেছিল গুপী। শঙ্কিত গলায় সে বলল, 'আজই ?'

'হ্যা আজই। আর আমি দেরি করব নি।' কুবের বলতে লাগল, 'শুভো কাজ বেশি দিন ফেলে রাখতে লেই, তাতে কখন

কী ঝাগড়া পড়বে! এই ক' বচ্ছর ধরে তুদের বে'টা ঝুলে থেকে আমার আক্কেল হয়ে গেচে।'

একটু চুপ।

কুবের আবার শুরু করল, 'তা এক কাজ কর। আমায় এককুড়ি টাকা দে।'

'কেন?' কাঁপা গলায় গুপী শুধলো।

'কেন বুঝতে পারচিস নি! শুদু হাতে কখনো 'বে'র কথা হয়?'

'কিন্তুক—'

'কী?'

'অত টাকা তো লেই।'

'তা হলে দু বস্তা ধানই দে।'

'ধান দোব!' গুপী অবাক হয়ে গেল।

কুবের বলল, 'হ্যা, দু বস্তা ধানের ওজন পেরায় দু মণ। বেচলে টাকা কুড়িক পাওয়া যাবে। ওই টাকাটা পোণ হিসেবে ধরে লোব।'

সঙ্গে করে দুটো বস্তা এনেছে কুবের। সে জানত, টাকা দিতে নারাজ হতে পারে গুপী। থাকলেও বলতে পারে নেই। কিন্তু ঘরে তার নতুন ধান আছে। ধান নিয়ে লুকোচুরি চালানো সম্ভব নয়। কাজেই একেবারে তৈরি হয়ে এসেছিল কুবের। নিতান্তই যদি টাকা না পাওয়া যায়, ধানই নিয়ে যাবে।

বস্তা দুটো গুপীর দিকে এগিয়ে দিয়ে কুবের বলল, 'যা, ভত্তি করে আন—'

গুপী বলতে চাইল, 'না-না একদানা ধানও তুমায় দোব নি। তুমার মেইয়েকে বে করার সাধ আমার লেই।' অনেক চেষ্টা করল সে। প্রাণটা ফেটে গেল তার, তবু গলায় আওয়াজ ফুটল না।

কুবের তাড়া লাগাল, 'যা—'

কুবেরের গলায় এমন কিছু রয়েছে, যা অমান্য করা গুপীর সাধ্যের বাইরে। আস্তে আস্তে উঠে পড়ল সে। ঘর থেকে বস্তা

বোঝাই করে ধান এনে কুবেরের কাছে রাখল। তারপর অবসন্নের মত বসে পড়ল।

কুবের বলল, 'ধান দিলি। ধর, পোণ বাবদে এক কুড়ি টাকা পেলম। পোণের বাকি আট কুড়ি টাকা তোর সুবিদে মতন এট্টু এট্টু করে শুদিস।'

গুপী জবাব দিল না।

কুঞ্জরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একটু দূরে বসে ছিল তাদের দিকে ফিরে কুবের এবার বলল, 'এ্যাখন তা হলে, কতাবাত্তা পাকা করে লেওয়া যাক—তুমরা কী বল—'

'লিচ্চয়—' একসঙ্গে সবাই সায় দিল।

কুবের ডাকল, 'মাস্টের—'

'মাস্টের' নামধারী লোকটা সবার পেছনে বসে ছিল। ডাকা-মাত্র সামনে এগিয়ে এল।

মাস্টেরের আদত নাম তিনকড়ি। হাল আমলের কেউ ও নামটা জানে না। পুরনো আমলের যারাও বা জানে, ও নামে ডাকে না। তিনকড়ি নয়া বসতের একমাত্র শিক্ষিত লোক। শিক্ষার সম্মানে সবাই তাকে মাস্টের বলে ডাকে। মাস্টের নামেই তার খ্যাতি এবং খাতির, দুই-ই।

বেশ বয়েস হয়েছে মাস্টেরের : পঞ্চাশ প্রায় ছুঁই-ছুঁই। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। চুল এলোমেলো, অবিন্যস্ত। রোদে পুড়ে জলে ভিজে গায়ের রঙ তামাটে। অস্বাভাবিক লম্বা আর পাকানো তার শরীরটা। সব চাইতে অদ্ভুত হল চোখদুটো। কেমন যেন ভাবলেশহীন ; হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মাছের চোখ। পরনে হাত-কাটা ফতুয়া আর খাটো ধুতি। সংক্ষেপে এই হল মাস্টেরের পোশাক-আশাক আর চেহারার বর্ণনা।

মুরুব্বি বলল, 'কাগজ-পত্তোর বার কর মাস্টের।'

ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ এবং দোয়াত-কলম বার করল মাস্টের।

মুরুব্বি [illegible], 'এবেরে আমি যা বলি বেশ ভাল করে নিকে (লিখে) ফ্যাল।'

দোয়াতে কলম ডুবিয়ে মাস্টের প্রস্তুত হল।

কুবের বলতে লাগল, 'নেক (লেখ), আমি শিরি গুপীচরোণ বেরা—'

কুবেব যা বলল এবং মাস্টের যা লিখল, মোটামুটি এই রকম—

'আমি শিরি গুপীচরোণ গায়েন, বাপ শিরি বেরজাচরোণ গায়েন, সাকিম লয়া বসোত চব্বিশ পরগোণা, মুরুব্বি শিরি কুবিরচন্দোরের একমাত্তর মেইয়েকে এই অঘ্‌ঘান মাসের সাতাস তারিকে বে' করিব বলে পাকা কতা দিলম।

বে'র পোণ বাবদ মুরুব্বিকে তু'বস্তা ধান অর্থাৎ এক কুড়ি টাকা দিলম। বাকি আট কুড়ি টাকা মাসে মাসে কিচু কিচু দিয়ে শুদ করিব। এই সব কতাব খেলাপ করলে ভগোমানের কাচে দায়ী থাকিব। ইতি।

লেখা কাগজখানা গুপীর হাতে দিয়ে কুবের বলল, 'এট্টা টিপ সই দে—'

এই যে কবের এসেছে, পণের বাবদে ধান নিয়েছে, কাগজে টিপ সই দিতে বলছে—গুপীর মনে হচ্ছে, এ সব সত্যি নয়, কেমন যেন অবাস্তব। সব কিছু বুঝি বা স্বপ্নের ঘোরে ঘটে যাচ্ছে।

কুবের আবার বলল, 'কি-রে, টিপ সইটা দিয়ে দে। অমন জুবুথবু হয়ে বসে আচিস কেন?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপ মারল গুপী।

কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে কুবের বলল, 'মনে রাখিস, আজ বিশে অঘ্‌ঘান, সাতাশ তারিকে বে'। মাঝখানে মাত্তর ছ'টা দিন আচে।'

গুপী নিরুত্তর।

বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। দেখা গেল, তিনটি মানুষের মুখচোখ থেকে খুশি উপচে পড়ছে। এই তিনজন হল নটবর,

ভাঁটুনী আর কুবের। গুপীর এই বিয়েটার সঙ্গে [illegible] প্রত্যেকের একটা করে সমস্যা জড়িত।

ভাঁটুনীর সমস্যাটা জীবন-মরণের। নিশি যদি গুপীর সংসারে আসত, তাকে দূর করে দিত। এই বুড়ো বয়সে আবার কোথায় আশ্রয় খুঁজতে বেরুত সে?

কুবেরের সমস্যাটা হল তার মর্যাদার। বছর কয়েক ধরে গুপীর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রেখেছে সে। বিয়েটা না হলে বড় হেয় হতে হত তাকে। লোকের কাছে মুখ দেখানো যেত না।

নটবরের সমস্যাটা হল তার লালসার। গুপীর সঙ্গে ভামিনীর বিয়ে না হলে তার পক্ষে নিশিকে পাওয়ার পথটা সুগম হয় না।

লেখা কাগজে গুপীর টিপ সই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের তিনটে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল যেন।

ঘরের চৌকাটের কাছে চুপচাপ বসে ছিল ভাঁটুনী। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি সে। এবার বলে উঠল, 'বাবারা, আজ এ্যামন ভাল দিন, আমার গুপীর বে'র কতা পাকা হয়ে গেল। তাই আমার পেরাণে এট্টা ইচ্চে হয়েচে—'

'কী ইচ্চে?' কুবের শুধলো।

'তুমরা কিচু মুখে না দে এ বাড়ি ঠেঙে যেতে পারবে নি।'

সোল্লাসে কুবের বলল, 'লিচ্চয়, কী খাওয়াবে, লিযে এস—'

ঘর থেকে ধামা বোঝাই করে মুড়ি আর আখের গুড় নিয়ে এল ভাঁটুনী।

খেতে খেতে কুবের গুপীকে বলল, 'আজ হল তো তোর বুদবার। শুক্কুর শনিবার নাগাত বে'র বাজার করতে বেরুব। বল্, কী লিবি—'

'কী লোব!' ঘোরের মধ্য থেকে গুপী যেন বলে উঠল।

'লাও ঠ্যালা!' দু-হাত ঘুরিয়ে কুবের বলল, কী লিবি, সে তো তুই জানিস। তোর মন কী চায়, আমি ক্যামন করে জানব!'

গুপী উত্তর দিল না। তার পিঠে সস্নেহে একটা চাপড় মেরে কুবের বলতে লাগল, 'নাজ (লজ্জা) লাগচে ! তা তো লাগবার কথাই। মুখ ফুটে তুই না চাইলি ; তুকে আমি ঠকাবো নি।'

গুপী এবারও চুপ।

বিয়ের ব্যাপারে আরো দু-চারটে কথা হল। তারপর সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল কুবের।

চব্বিশ

কুবেররা চলে যাবার পরই গুপী বেরিয়ে পড়ল। দিশেহারার মত খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরল। ঘুরে ঘুরে এক সময় খাড়ির পারে এসে বসল।

নিশি যে তাকে কতখানি আচ্ছন্ন করে আছে, এতকাল বুঝতে পারে নি গুপী। সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণাই তার ছিল না। আজ বিয়ের চুক্তিতে সই করার পর প্রথম বুঝতে পারল, প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে।

এখন সে কী করবে, কী করা উচিত—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না গুপী। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা, শূন্য। কোন কিছু সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার মত অবস্থা এখন নয়।

একবার গুপী ভাবল, গগন গায়েনের কাছে যাবে : হাজার হোক সে বন্ধুলোক ; তার কাছে নিশ্চয়ই সু-পরামর্শ পাওয়া যাবে। পর মুহূর্তেই গুপীর মনে হল, গগন এখন নয়া বসতে নেই। দিন সাতেক হল গানের বায়না নিয়ে কাকদ্বীপ গেছে।

তবে কি একবার নিশির কাছেই যাবে ! ভাবামাত্র উঠে পড়ল গুপী। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'হেই গো শুনচ—'

ঘুরে দাঁড়াল গুপী। দেখল, খাড়িপারের উঁচু বাঁধের ওপর ভামিনী দাঁড়িয়ে আছে।

অনেক দিন পর ভামিনীকে দেখা গেল। এতকাল তাকে না

দেখার কারণও আছে। বিয়ের ব্যাপারে [illegible] বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করাতে হলে যা তাকে করতে হত, সে সবই করেছে তার বাপ। কাজেই গুপীর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন তার ছিল না।

চোখাচোখি হতেই ভামিনী হাসল। বলল, 'তুমার খোঁজে সারা লয়া বসত চষে বেড়াচ্চি। আর তুমি এখেনে রয়েচ!' বলতে বলতে বাঁধ থেকে নীচে নেমে এল।

ভামিনী কাছে আসতে ভারী অসহায় বোধ করল গুপী। বলল, 'আমায় খুঁজচ কেনে?'

'বা-বে, খুঁজব নি! আজ আমার কত আল্লাদের দিন! পেরাণটা কি খুশী যে হয়েচে!' চাপা, আহ্লাদে গলায় ভামিনী বলল।

'তাই নাকিন?' গুপী শুধলো। তার গলায় ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

'হ্যা গো, হ্যা।' ভামিনী বলতে লাগল, 'এট্টু আগে বাপ বাড়ি গে কইলে তুমার সন্‌গে আমার বে'র কথা পাকা হয়ে গেচে। আর সাতদিন পর আমাদের বে' হবে। শোনা মাত্তর তুমার খোঁজে বেইরে পড়িচি!'

অস্ফুট গলায় গুপী কি বলল, বোঝা গেল না।

গুপীর একটা হাত ধরে ভামিনী বলল, 'চল, কুথাও বসি। তুমার সন্‌গে ঢের কতা আচে।'

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিল গুপী। বলল, 'কতা শোনার সোময় এ্যাখন লেই। একজনের সনগে এক্ষুনি আবার দেখা করতে হবে।'

ভামিনীকে আর কিছু বলা বা করার সুযোগ না দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিশির বাড়ির দিকে ছুটল গুপী।

একটুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল ভামিনী। তারপর গুপীর উদ্দেশে ভেংচি কেটে বলল, 'আচ্ছা বে'টা একবার চুকে যাক, ত্যাখন কতা শোনার সোময় হয় কি-না, দেখব।' বলেই হেলেদুলে, ভারী মাজা বাঁকিয়ে-চুরিয়ে আবার বাঁধে গিয়ে উঠল।

চোখ যায়, [illegible] [illegible] পাথরের চাঙড়ার মত মেঘ ঝুলছে। মেঘটা কিছুতেই কাটছে না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটা ছেঁড়া শাড়ি নিয়ে বসেছিল নিশি। ইচ্ছা ছিল শেলাই করে নেবে। ইচ্ছাটা কিন্তু মনেই থেকে গেছে ; কাজে আর হয়ে ওঠে নি। শাড়িতে দু-একটা ফোঁড় দিয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

অঘ্রানের শেষাশেষি এই দিনগুলো নিশির পক্ষে ভারি দুঃসময় এ-সময় মাছমারাদের ঘরে ঘরে নতুন ধান আছে। তাছাড়া সমুদ্রও এখন কৃপণ, কাজেই মাছ ধরা একরকম বন্ধ। মাছ ধরা বন্ধ হওয়া মানেই নিশির কাজকর্ম রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া। আজকাল আর কেউ তার কাছে জাল সারাতে আসে না।

সেই মাঘ মাস পর্যন্ত এমন দুরবস্থা চলবে। তারপর ফাল্গুন মাস পড়লে যখন দক্ষিণ দিক থেকে এলোপাথাড়ি বাতাস ছাড়বে সমুদ্র তখন সদয় হবে, তার বন্ধ মুষ্টি খুলে যাবে। সেই সময় মাছমারারা আবার জাল নিয়ে খাড়ির দিকে ছুটবে।

ফাল্গুন মাস আসতে এখনো অনেক দেরি। ততদিন কী খাবে কী করবে, ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠল নিশি।

ভাবনাটা কতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, হুঁশ নেই। হুঁশ যখন ফিরল, নিশি দেখল, সামনের চড়াই বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে আসছে গুপী। চোখদুটো তার লালচে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। পা ফেলছে, ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত আর ক্ষ্যাপাটে মনে হচ্ছে তাকে। গুপীর এমন চেহারা এর আগে আর কখনো দেখে নি নিশি।

এক সময় কাছে এসে পড়ল গুপী। চাপা, ভাঙা গলায় বলল, 'সব্বোনাশ হয়ে গেচে মেইয়েছেলে—'

'কী হয়েচে !' নিশি চকিত হল।

'এট্টু আগে মুরুব্বি আমার ওখেনে এয়েছেল। জবরদস্তি

করে তার মেইয়ের সনগে [illegible]
গেচে।'

মনে মনে চমকে উঠল নিশি। কাল রাত্তিরে মুরুব্বি তাকে শাসিয়ে গেছে কিন্তু আজ সকালের মধ্যেই সে যে এতদূর এগুবে, নিশির পক্ষে তা ছিল অকল্পিত।

চমকটা মনেই থেকে গেল। মুখেচোখে সেটাকে ফুটে উঠতে দিল না নিশি। খুব স্বাভাবিক গলায়, একটু বা কৌতুক করেই বলল, 'বে'র ব্যাওস্থা পাকা হয়ে গেচে, এ তো খুব ভাল কতা গো।'

'একে তুমি ভাল কইচ!' গুপীর চোখদুটো কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন দেখাল।

'কইচি তো। ক' বচ্ছর ধরে মুরুব্বির মেইয়ে তুমার মুখের দিকে চেয়ে আচে। এ্যাদ্দিনে সে তার জিনিসটা পাবে—' নিশি বলল।

'কিন্তুব—'

'কী?'

রুদ্ধ গলায় গুপী শুরু করল, 'তুমি তো সবই জান—

'কী জানি?' নিশি উন্মুখ হল।

'তুমার মন আর আমার মন।' একটু চুপ। তারপর গুপী আবার বলল, 'একদিন না কয়েছিলে, আমি ছাড়া তুমি মিছে। মনে পড়ে?'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না নিশি। একটু থেমে একটু ভেবে নরম গলায় বলল, 'পড়ে।'

'তবে?' গুপী কাছে এগিয়ে এল।

'ঠিক ভরসা পাচ্চি নি ব্যাটাছেলে।' নিশি ফিস ফিস করে উঠল।

'কী?'

'জোর করে পরের সোনা কানে দিতে। জ্ঞানী তো কতায় বলে, পরের সোনা দিও নি কানে; টেনে নে যাবে হ্যাচকা টানে। তাই—'

'পরের সোনা আবার কী?'

'তুমার সোনা'।

'আমি পরের সোনা!' গুপীর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

'লয় তো কী! তুমি ভামিনীর সোনা।' নিশির গলাটা কাঁপল।

'মিছে কতা, মিছে কতা। আমি তুমার।' চিরকালের ভীরু দুর্বল আর দ্বিধাগ্রস্ত গুপী এই মুহূর্তে গলায় সবটুকু জোর ঢেলে চেঁচিয়ে উঠল।

একদৃষ্টে গুপীর দিকে তাকিয়ে রইল নিশি। কি যেন ভেবে বলে উঠল, 'সত্যিই যদি আমার সোনা হও. আমারই থ কবে।'

'মুরুব্বি তার মেইয়েব সনগে বে'র ব্যাওস্থা কবে ফেলেছে। তভু কইচ, আমি তুমার থাকব?'

'হ্যা!'

'কিন্তুক ক্যামন করে?' অসহায়, দুর্বল গলায় গুপী শুধালো।

'ক্যামন করে থাকবে আমি লিজেই কি ছাই জানি—' নিশি হাসল।

পঁচিশ

মাঝখানে দুটো দিন ছোটাছুটি করে বেড়াল কুবের। নয়া বসতের ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন কবল। এমন কি নিশিকেও বাদ দিল না।

দশটা নয়, পাঁচটা নয, একটা মাত্র মেয়ে। ... র বিয়েতে রীতিমত ঘটা করবে মুরুব্বি।

দু-দিনের মধ্যে এদিককার নেমন্তন্নের পালা চুকল। আজ সকালে পাতিবুনিয়ার হাটে রওনা হল কুবের। উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথমত, বিয়ের বাজার করা। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুত ঠিক করা। তৃতীয়ত, ভূষণকে নেমন্তন্ন করা।

কুবেরের চেহারাখানা দেখবার মত হয়েছে। অন্য দিন কালো খসখসে চামড়া থেকে খই ওড়ে। তেলে ভিজে সেই চামড়া আজ

কাষ্ঠ পাথরের মত মসৃণ হয়েছে, দস্তরমত [illegible] ফেঁসোর মত চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত করে চাঁছা। পরনে ক্ষারে কাচা ধুতি আর ফতুয়া।

মেয়ের বিয়ে দেবে কুবের। প্রাণে তার অঢেল আনন্দ।

কুবেব যখন পাতিবুনিয়ায় এসে পৌঁছল তখন তুপুর। তুপুর যে, সেটা আন্দাজে বুঝতে হল। আন্দাজে, কেননা আকাশটা মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। মেঘের জন্য বেলা ঠিক করা তুরূহ।

হাট এখন সরগরম। গো-হাটা. পান-হাটা, নৌকো-হাটা—সব জায়গায় মানুষ গিসগিস করছে।

কোনদিকে তাকাল না কুবের। সোজা ভূষণের দোকানে গিয়ে উঠল। তার ইচ্ছা, ভূষণের নেমন্তন্ন সেরে বিয়ের বাজাব করতে বেরুবে।

ভূষণ দোকানেই ছিল। বলল, 'আয় কুবির, তোর কতাই ক'দিন ধবে ভাবছেলম। আজ যদি না আসতিস কাল তুদেব লয় বসতে যেতম।'

বসতে বসতে কুবেব বলল, 'কেন, কিচু দবকাব আচে ভূষোণদা?'

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল ভূষণ। হঠাৎ তার খেয়াল হল কুবেরের চেহারা এবং পোশাক-আশাক অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। বিশ বছর কুবেরকে দেখছে সে। কিন্তু কোনদিন সাজসজ্জাব এমন বাহাব চোখে পড়ে নি।

একটুক্ষণ কুবেরের দিকে তাকিযে বইল ভূষণ। তাবপব বলল. 'কি-রে, খুব সাজগোজ করিচিস দেখচি।'

'কুথায়!' একটু যেন লজ্জাই পেল কুবের। মুখ নামিযে বলল, 'মেইয়েটার বে' দোব ঠিক করিচি। এ্যাখন আর নোংরা টেনি পরে গোঁপদাড়ি লিয়ে বোনমানষের (বনমানুষের) মতন থাকা মানায় না। কি বল ভূষোণদা—'

'মেইয়ের বে' একেবারে ঠিক করে ফেলিচিস?'

মা। এ মাসের সাতাশ তারিকে বে'। তুমি যাবে কিন্তুক। তুমার লেমন্তন্ন রইল।'

'এ-সোময় বে'টা ঠিক করলি কুবির! কাজটা বোধ হয় ভাল হল নি।' কেমন যেন চিন্তিত দেখাল ভূষণকে।

'কেনে?' কুবের চকিত হয়ে উঠল। ইন্দ্রিয়গুলো তার খুবই প্রখর। ভূষণের কথাগুলোর মধ্যে কিসের যেন একটা আভাস পেয়েছে সে।

'আমার মুখ ঠেঙে নাই বা শুনলি। কাল বিকেলের দিকে একবার আয়। বঙ্কিমও আসবে। তার কাচেই সব শুনবি।'

'বঙ্কিম কে?'

'কাল আয়. এলেই জানতে পাবি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ কুবের বলল, 'এট্টু আগে যে কইলে. আমি যদি আজ না আসতুম কাল তুমি যেতে। কেনে?'

'কাল এলেই বুঝতে পারবি।' ভূষণ বলল।

'কুনো খারাপ খপর আচে ভূষোণদা?'

'আজ আমি কিচ্ছু কইব নি।'

কুবেরের মন বলতে লাগল, নিশ্চয়ই খারাপ খবর আছে। হাজার পীড়াপীড়ি করেও কিন্তু ভূষণের কাছ থেকে সে সম্বন্ধে কোন হদিস পাওয়া গেল না।

বিয়ের বাজার করা আর হল না। শঙ্কিত, ‥কণ্ঠ কুবের একসময় নয়া বসতে ফিরে গেল।

কথামত পরের দিনও ভূষণের দোকানে এল কুবের। দেখল, গা ঘেষে একটা লোক বসে আছে।

দাঁড়ালে লোকটা কমপক্ষে চার হাত লম্বা হবে শিরদাঁড়াটা ধনুকের মত বাঁকানো। সমস্ত শরীরটা দড়ি-পাকানো। লালিত্যহীন, ভাঙাচোরা মুখ, থ্যাবড়া নাক। চোখে শকুনের দৃষ্টি মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি।

কুবেরের মনে হল, এই লোকটাই বঙ্কিম। তার অনুমান যে সত্যি, পরমুহূর্তে বোঝা গেল।

ভূষণই উদ্যোগী হয়ে দু-জনের আলাপ করে দিল। লোকটাকে দেখিয়ে কুবেরকে বলল, 'এই হল বঙ্কিম, এর কতা কাল তুকে কয়েছেলম।' কুবেরকে দেখিয়ে বঙ্কিমকে বলল, 'এ হল গে কুবির মুরুব্বি। সমুদ্দুরের মুখে এরাই গাঁ বসিয়েছে।'

কুবের এবং বঙ্কিম পরস্পরের দিকে তাকাল।

বঙ্কিম বলল, 'তুমায় পেয়ে ভারি সুবিদে হল মুরুব্বি। লইলে এ্যাখন আবার তুমাদের ওখেনে দৌড়ুতে হত।'

'কেনে ?' কুবের শুধলো।

'তুমরা যেখেনে গাঁ বসিয়েচ, মেদিনীপুরের ভেড়িবাবুরা ও-জায়গাটার মালিক। আমি তেনাদের (তাঁদের) গুমস্তা। আমার ওপর হুকুম হয়েছে—'

বঙ্কিমের কথা শেষ হবার আগেই কুবের চেঁচিয়ে উঠল, 'সমুদ্দুরের মুখের মাটিটুকুনেরও মালিক আচে !'

বঙ্কিম গোমস্তা খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল। হাসির দাপটে তার লম্বা, কদাকার শরীরটা বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল। হাসিটা কমলে সে বলল, 'পিরথিমীর কুথাও একছটাক ফালতু মাটি পড়ে লেই। মানুষ জগৎ বেড় দে ফেলেচে।'

ভাঙা গলায় কুবের বলল, 'হা ভগমান !'

বঙ্কিম ডাকল, 'মুরুব্বি—'

'বলো—'

'ভেড়িবাবুদের ইচ্চে, সমুদ্দুরের মুখে মাছের ভেড়ি বসাবে, বুঝলে।'

কুবের হাঁ বা না, কিছুই বলল না।

বঙ্কিম বলতে লাগল, 'তাই ও জায়গাটা তেনাদের দরকার। আসচে মাসের ভেতর ওখেন ঠেঙে তুমাদের উটে যেতে হবে।'

কুবেরের নিঃশ্বাসটা যেন আটকে এল। দিশেহারার মত

বঙ্কিমের একটা হাত ধরল সে। ঝাপসা গলায় বলল, 'ওখেন ঠেঙে উটে কুথায় যাব আমরা ? আর তো যাবার জাযগা লেই। এর পর তো শুদু সমুদ্দুর।'

'কুথায় যাবে আমি ক্যামন করে কইব। পরের মাটিতে বসত গড়েচ, সে বসত কখনো টেকে ! তুমাদের উটতেই হবে মুরুব্বি। মনে রেখো, আসচে মাসে ভেড়িবাবুরা জমিনের দখল লিতে যাবে। আমার ওপর এই খপরটা দেবার হুকুম হয়েছেল, দিয়ে গেলম।' বলতে বলতে বঙ্কিম উঠে পড়ল।

কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে নয়া বসতের দিকে ছুটল।

ছাব্বিশ

ভূষণের দোকান থেকে ফিরে নয়া বসতের সবাইকে নিজের বাড়ি ডেকে আনল কুবের। বঙ্কিম গোমস্তার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে আগাগোড়া সব বলল।

এখন রাত খানিকটা বাড় হয়েছে। চারপাশে চারটে মশাল জ্বলছে। ভেজা বাতাসে ঘা খেয়ে মশালগুলো এক-একবার নিবু নিবু হয়ে যায়, পরমুহূর্তে সতেজ হয়ে ওঠে।

আকাশে অসময়ের ঘন কালো মেঘ। নীচে মুরুব্বির ডেরার সামনে জমায়েতটা থমথম করছে। জমায়েতে নেই কে ! বউ-ছেলে, বাড়া-বাচ্চা, নয়া বসতের তাবত বাসিন্দা সেখানে দলা পাকিয়ে আছে। পোড়া তামারঙের সারি সারি মুখ। সেই মুখগুলোর ওপর ভয়, উদ্বেগ আর আতঙ্ক ছায়া ফেলে যাচ্ছে।

দমবন্ধ গলায় হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'মুরুব্বি—'

'কী ?' কুবের সাড়া দিল।

'আমাদের কী হবে ?'

কুবের জবাব দিল না। ফেস্সোর মত লম্বা লম্বা চুলগুলো খামচা মেরে ধরল।

সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'এবেবে আমরা য়া'ব কুথায় ? পিবথিমীর আব কুথাও তো মাটি লেই !'

'হু—' আবছা একটা শব্দ কবল কুবেব।

জমাযেতটা এতক্ষণ চুপ কবে ছিল। হঠাৎ তার মধ্য থেকে সন্ত্রস্ত একটা গুঞ্জন উঠল, 'হেই ভগমান, তুমাব মনে এই ছেল।'

বিড় বিড় কবে কুবেব কী বলল, বোঝা গেল না।

গুঞ্জনটা আস্তে আস্তে কান্নাব রূপ নিল। প্রথমে অনুচ্চ, চাপা গলায, পবে জোবে জোবে কেঁদে উঠল মানুষগুলো।

চোখ বুজে কিছুক্ষণ কান্নাব শব্দটা শুনল কুবেব তারপব খেঁকিযে উঠল, 'এ্যাই মড়াগুলোন, চেল্লাচ্ছিস কেনে ?'

মুরুব্বিব খেঁকানিতে কান্নাটা ঝিমিযে পড়ল। কিন্তু সে মুহূর্তেব জন্য। পবক্ষণেই ঝিমিযে-পড়া কান্না চড়তে লাগল।

এবাব আব খেঁকাল না কবেব। খেঁকিযে ওঠাব মত জোবটাই সে পেযে উঠছে না।

লোকগুলো কাঁদে আব একই কথা বাববাব বলে, 'মুরুব্বি গো, আমাদের কী হবে ! শরীলেব রক্ত জল কবে ঘরদোর তুললম। এ-সব ফেলে কুথায় গে মাথা গুঁজব ?'

কুবেবও সেই কথাটাই ভাবছে। এবাব কোথায় তারা যাবে ? উত্তরে বা দক্ষিণে, কোনদিকেই যাবার যো নেই। উত্তবেব সব মাটিই কাবো না কারো দখলে বযেছে। আব দক্ষিণে তো সমুদ্রই।

মেযেব বিযেব ভাবনাটা সে একেবাবেই ভুলে গেছে এখান থেকে উৎখাত হতে হবে। সেই চবমসর্বনাশের চিন্তায় সে আচ্ছন্ন।

মুরুব্বির ঠিক পাশেই বসে ছিল কুঞ্জ। সে বলল. 'কতা কইচ নি কেনে মুরুব্বি ? বল, এরপব আমবা কুথায় যাব ?'

কুবের জবাব দিল না।

কুঞ্জ আবার বলল, 'আসচে মাসেই তো ভেড়িবাবুরা জমিনের দখল লিতে আসবে। তাই লয় ?'

'হ্যা—' কুবের ঘাড় কাত করল।

'তারা এসে পড়ার আগে আমাদের তো এট্টা উপায় ঠিক করতে হবে!'

'কী করব, তুই বল্ তো কুঞ্জ।' ভাঙা, বসা গলায় কুবের বলল, 'এ্যাখন আমার মাথার ঠিক লেই। কুনো উপায় ঠিক করতে পারচি নি।

একটু চুপ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কুবের আবার শুরু কবল, 'পিরথিমীতে যদি আমাদের ঠাঁই দিতেই না পাবলে তবে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছেলে কেনে, হেই ভগমান—'

কোনদিন কুবেরকে এমন বিচলিত এবং অস্থির হতে দেখা যায় নি। না হওয়াব কারণও ছিল। এর আগে যতবার বসত ভেঙেছে, তাদের আসা ছিল সামনের দিকে এগুলে মাটি পাবে, মাথা গোঁজার একটা আশ্রয়ের অভাব অন্ততঃ হবে না। কিন্তু এবাব কোন ভরসাই নেই। সামনের দিকে এবার শুধু ধু-ধু সমুদ্র।

জীবনের কোন পর্বেই হাব মানে নি কুবের। যতবাব তাদের বসত ভেঙেছে, ততবারই বিপুল উদ্যমে নতুন আশ্রয়েব খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে। কোন অবস্থাতেই সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে চিবকালেব সেই অপবাজিত মানুষটিকে অসহায়, আশাহত, পঙ্গু এবং করুণ মনে হচ্ছে। তার শক্ত, মজবুত শিরদাঁড়াটা যেন ভেঙে বেঁকে দুমড়ে গেছে।

কুঞ্জ বলল, 'অত ভেঙে পড়নি। তুমি আমাদেব মুরুব্বি। তুমি যদি এ্যামন কর, আমরা কার মুখেব দিকে চাইব ? কাব ভরসা করব ?'

কুঞ্জর কথায় অনেকটা সামলে নিল কুবের। দেখল, নয়া বসতের মানুষগুলো গুড়িয়ে গুড়িয়ে অদ্ভুত শব্দ করে কাঁদছে। তাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। হঠাৎ তার কি যেন হল।

লাফ মেরে উঠে পড়ল। তারপর উন্মাদের মত [illegible] চেঁচাতে লাগল, 'এখেন ঠেঙে কুত্থাও যাব নি। সারা জীবন কুকুরের মতন ঢের খেদানি সয়েচি। বার বার বসত গড়ে বার বার ফেলে গেচি। কিন্তুক আর পারব নি, কিচুতেই লয়। তাতে যা হবার হবে—'

কুবেরের গলা ক্রমাগত চড়তে লাগল।

নয়া বসতের প্রতিটি মানুষ ভীত, চকিত, বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন।

কিন্তু একজনের শুধু বিকার নেই। সে নিশি। জমায়েতের এককোণে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে একদৃষ্টে কুবেরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার ঠোঁটে সর্বনাশা হাসি ফুটে রয়েছে।

সাতাশ

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হল শেষ পর্যন্ত। অসময়ের মেঘ সহজে রেহাই দিল না।

কাল ভেড়িবাবুদের জমি-দখলের খবরটা এসেছে। আর আজ বিকেল থেকেই তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

ক'দিন ধরেই পাথরের চাঙড়ার মত কালো কালো মেঘগুলো জমাট বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। কিন্তু আজ যা আরম্ভ হয়েছে তার তুলনা নেই। চারিদিক ঝাপসা করে তীরের ফলার মত একটানা জল ঝরছে। তার সঙ্গে জুটেছে ঝড়ো, ক্ষ্যাপা বাতাস। অগ্নিকোণ থেকে পাক খেতে খেতে ছুটে এসে সেই বাতাস নয়া বসতকে নাস্তানাবুদ করে ফেলছে। আকাশের সীমাহীন অবয়বটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে বাজ পড়ে। দিগন্তের ওপর দিয়ে সাপের জিভের মত বিদ্যুৎ চমকে যায়।

সমুদ্র মুখের এই সৃষ্টিছাড়া উপনিবেশটা যেন লক্ষ বছর আগের কোন আদিম দুর্যোগের দিনে ফিরে গেছে।

শুধু কি আকাশ আর বাতাসই, সমুদ্রও আজ উন্মত্ত। প্রচণ্ড নেশা করলে যেমন হয়, তার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তেমনি উচ্ছৃঙ্খল, তেমনি হঠকারী, তেমনি মরীয়া।

খাড়ির মুখে সমুদ্র ফুলে ফুলে বিপুল হয়ে উঠছে। তারপর দুর্জয়বেগে পারে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বুঝি বা তার ইচ্ছা নয়া বসতের সামান্য ভূমিটুকু পৃথিবীর দখল থেকে ছিনিয়ে নেবে।

ভেড়িবাবুরা একদিক থেকে হাত বাড়িয়েছে। আরেক দিক থেকে সমুদ্র। মাঝখানে নয়া বসতের অস্তিত্বটা অসহায়, বিপন্ন এবং ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঘরে চিৎকার উঠছে, 'হেই মা গোসানী, ঠাণ্ডা হ ঠাণ্ডা হ পেরানে মারিস নি। হেই মা—'

ঝড়ে গুপীর ঘরের চাল উড়ে গেছে। এখন ভেতরে থাকা না-থাকা সমান।

সব আগে ভাটিনীকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাঠিয়ে দিল গুপী।

ঘরভর্তি জিনিসপত্তর। তা ছাড়া ক'দিন আগে নতুন ধান উঠেছে। সে-সব টেনে এককোণে স্তূপাকার করল গুপী। কিন্তু পরিশ্রমই বৃথাই। চাল উড়ে যাওয়াতে ভেতরে যা জল পড়েছে তাতে কিছুই বাচানো যাবে না। দু-বছর তারা এখানে এসেছে কিন্তু ঝড়জলের এমন মাতামাতি আর কখনো দেখে নি।

গুপী একবার ভাবল, জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে অন্য কারো ঘরে গিয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই তার মনে হল, নয়া বসতের প্রায় সব ঘরই গোলপাতার। এই তাণ্ডবে একটা ঘরও কি অক্ষত আছে!

অগত্যা নিরুপায় এবং হতাশ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল গুপী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। কী করবে, কোন দিকে যাবে, ঠিক করে উঠতে পারল না।

হঠাৎ গুপীর চোখে পড়ল, কুবের পাগলের মত নয়া বসতের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আর

চেঁচাচ্ছে, 'হেই ভগমান, ই কি হল! এখেনে কি টেঁকতে দে নি! হেহ ভগমান!'

চেঁচাতে চেঁচাতে একসময় গুপীর সামনে এসে পড়ল কুবের। কোমরে সামান্য একটু টেনি। এ-ছাড়া সমস্ত দেহে অন্য কো আবরণ নেই। ফলে, জলে ভিজে সে প্রায় উলঙ্গ। কুবের বল 'দেঁড়িয়ে আচিস কেনে গুপী? চোকে দেখতে পাচ্চিস নি, সব ঘর ভেঙে পড়চে। শিগগির যা, যাকে পারিস আমার বাড়ি তোল।' বলেই সে ছুটল।

নয়া বসতে একখানা মাত্র পোক্ত টিনের বাড়ি কুবেরের। কুবের বেরিয়েছে সবাইকে নিজের ডেরায় নিয়ে তুলতে। সে এখানকার মুরুব্বি। কাজেই তাব অনেক দায়। নয়া বসত তাবত মানুষেব জীবন-মরণেব সমস্ত দায়িত্ব তার মাথায়।

জিনিসপত্তরের ভাবনায় এতক্ষণ মগ্ন ছিল গুপী। কু... কথায় নিজেকে ভারি স্বার্থপর মনে হল তাব। মনে হল, প্র বিপন্ন মানুষগুলির প্রতি তাব নিজেরও একটা কর্তব্য আছে।

কুবেব বাঁ দিকে গেছে। গুপীও আব দাঁড়াল না। ঘ জিনিসের ভাবনাটাকে সরিয়ে সে গেল ডান দিকে।

আকাশ শাসাচ্ছে, বাতাস শাসাচ্ছে, খাড়িব শাসাচ্ছে। আকাশ-বাতাস-সমুদ্র—তিনে একযোগে করেছে, নয়া বসতকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

গুপী এগিয়ে চলল। সামনের দিকে খানিকটা দূরে ঘব। গুপী ভাবল, তাদের অবস্থাটা একবার দেখে যা ঘরদোর ভেঙে গিয়ে থাকে তাদেব মুরুব্বির বাড়ি নিয়ে তু

কুঞ্জর ঘব পর্যন্ত পৌঁছনো গেল না। তার আগেই পেছ কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ব্যাটাছেইলে—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াল গুপী। ঘুরতেই যার সঙ্গে চোখাচোখি হল

এলোপাথাড়ি বাতাসে নিশির চুল উড়ছে। বৃষ্টিতে লালরঙের ডুরে শাড়িটা সর্বাঙ্গে লেপটে গেছে।